



আলোকধারা

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং চ-২৭২

২৯তম বর্ষ

৪৬ সংখ্যা

এপ্রিল ২০২৩ ইসায়ী

রমযান মুবারক



মহান ২২ চৈত্র
উরস শরিফ সংখ্যা

গাউসুল আযম হ্যরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর ১১৭তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ

এক নজরে: (১) উপজেলা প্রশাসনের সাথে গাউসিয়া হক মনজিলের প্রশাসনিক সমন্বয় সভা, (২) ১লা মাঘ মাইজভাণ্ডারী শরিফ শাহী ময়দানে ‘তাজকেরা-এ-চেরাগে উম্মতে আহমদী (দ.) মাহফিল, (৩) রওজা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীতে সম্মান প্রদর্শন, (৪) অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর রওজায় সম্মান প্রদর্শন, (৫) রওজা-ই-শাহানশাহ মাইজভাণ্ডারীতে পরিচর্যা, (৬) আশেক-ভক্ত-জায়েরীনদের সারিবদ্ধ আগমন, (৭) ল্লেহার্দ পরশ, (৮) মাইজভাণ্ডারী সুফি সংগীতের আসর, (৯) মুনাজাত।



মাসিক আলোকধারা

THE ALOKDHARA

A MONTHLY JOURNAL OF TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং চ ২৭২, ২৯তম বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা

এপ্রিল ২০২৩ ঈসায়ী
রমযান-সাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৯-৩০ বাংলা

প্রকাশক

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পরিত্র রক্ত ও
ত্বরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল
আযম মাইজভাণ্ডারী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল আযম
মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের খেদমতের হকদার,
তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের হকদার,
শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার-
মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্ডিলের
সাজাদানশীল
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক

অধ্যাপক জগত উল আলম

যোগাযোগ:

০১৭৫১ ৭৪০১০৬

০১৩১০ ৭৯৩৩৩২

মূল্য : ২০ টাকা \$=২

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৮২১১।
ফোন: ০২৩৩৪৪৫৪৩২৬-৭



এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে
মাইজভাণ্ডারী একাডেমি প্রকাশনা

www.sufimaizbhandari.org.bd
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

□ সম্পাদকীয়	২
□ তাজকেরা-এ চেরাগে উম্মতে আহমদী মাহফিলে রাহবারে আলম হ্যরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র ভাষণ বার্তা পরিবেশক	৩
□ বেলায়তে মোত্তাকা দাদশ পরিচেন্দ খাদেমুল ফোকুরা সৈয়দ দেলাউর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) পরিত্র বাণী	৯
□ উম্মুল মুমিনীন হ্যরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) মোঃ গোলাম রসূল	১৪
□ রমজান : পরিচল্ল মিঞ্চতার সাধনা মুহাম্মদ ওহীদুল আলম	১৫
□ আহলে বাইতে রাসুল (দ.)'র তাসাওউফ জগৎ ^১ অধ্যাপক জগত উল আলম	১৭
□ মোকার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাসের কবিতা: গাউসুল আযম হ্যরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দিব্যশক্তির প্রশংস্তি আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল	২৭
□ প্রেমিকের প্রেমাঙ্গদ হ্যরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) মোহাম্মদ সাজীদুল হাসান চৌধুরী	২৯
□ মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; হ্যরত আদম-হাওয়ার বংশধর (আলোকধারা প্রতিবেদন)	৩৩
□ মাহবুবে ইলাহী হ্যরত নিয়ামুন্দিন আউলিয়া'র খুত্বা সংকলন: গ্রন্থাঃ হ্যরত আমীর উলা সাজীরী (রহ.) অনুবাদ: কফিল উদ্দিন আহমদ চিশ্তী	৩৬
□ সুফি মাকাম পরিচিতিঃ দেহতন্ত্র বিশ্লেষণ আলোকধারা ডেক্স	৩৯
□ 'আয়নায়ে বাবী' কিতাবের ভাবার্থ এস এম এম সেলিম উল্লাহ্	৪৩
□ মহিলা মাহফিল হ্যরত শীস (আ.)-এর বেহেন্তী শ্রী হুর প্রসঙ্গ ফারাহানা আকতার চৌধুরী	৪৭
□ শিশুতোষ ছোট কাঞ্চনপুরের বড় উপলক্ষ মুহাম্মদ ওহীদুল আলম	৪৮

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা মহান স্বর্ণ সর্ব দ্রষ্টা আল্লাহর নামে। অগণিত দরবন্দ, নাত ও সালাম আখেরী নবী, আফদালুল আস্বিয়া, আফদালিল খল্ক ওয়াল ইনসান হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)'র প্রতি। প্রশংসন্তি, সালাম এবং বিনয় পেশ করছি গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীসহ সকল আস্বিয়া-আউলিয়া কেবলের প্রতি।

আল্লাহর অশেষ রহমতে তাসাওউফ বিষয়ক সুপরিচিত মুখ্যপত্র মাসিক আলোকধারা ২৯তম বর্ষের এপ্রিল ২০২৩ সংখ্যা প্রকাশিত হল। এবারের আলোকধারা প্রকাশ সময়ে ইসলাম ধর্মানুসারীদের অন্যতম ফরজ ইবাদত সিয়াম সাধন চলছে। মহাসমারোহে আয়োজন হয়েছে গাউসুল আয়ম বিল বিরাসাত বাবাজান কেবলা আলমের বার্ষিক উরস শরিফ। তাই এন্ডোটো উপলক্ষ্য সম্পর্কে রয়েছে তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ নিবন্ধ।

সিয়াম হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশে দিনে পানাহার সম্পূর্ণ পরিহার করে উপবাস যাপন এবং প্রতিটি কর্মে প্রবৃত্তিগত সংযম সাধন। মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আল্লাহ সাওম সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করেছেন। প্রত্যেক নবী রাসুল তাঁদের কওমকে সাওম সাধনার জন্যে আহ্বান জানিয়ে ঐশ্বী বাণী মানব সমাজে প্রচার করেছেন। সাওমের ইতিহাস সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় তা উল্লেখ রয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী সাওম বা রোজা পালন শুধু মুসলমানদের বিষয় নয়, বরং তা মানব জাতির জন্যে খোদায়ী বিধান হিসেবে ঘোষিত। রোজা তথা সাওম শুধু উপবাসে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পৃথিবীর বুকে মানব জীবনচারে সংযম শিক্ষার নির্দেশনাও বটে। তাই রোজা পালনের মধ্যে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি প্রবৃত্তির আঘাসী অত্মতি বিনাশের দীক্ষাও রয়েছে সমানভাবে। দৈহিক শক্তি নফস তথা প্রবৃত্তি মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে বেতাল ভূমিকায় প্ররোচিত করে মানুষকে ভ্রষ্টাচারে তৎপর রাখতে উদ্যোগী করে থাকে। রোজা পালনের মাধ্যমে দেহজাত শক্তি হ্রাসের কারণে মানব দেহের এই অপজোয়ার নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে থাকে। এ কারণে আত্মিক শক্তিকে প্রাণবন্ত ও উর্ধমুখী বিকাশ ধারায় গড়ে তোলার জন্যে সাওম সাধন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া সমাজে বসবাসরত খাদ্যাভাবে নিত্যদিন উপবাসরত মানুষের দৈহিক শক্তিহীনতা এবং কষ্টকর জীবনচার সম্পর্কে অভাব অন্টনহীন মানুষ সহজে অনুধাবনের দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়। দৈহিক বিভিন্ন রোগ নিরাময় এবং নিয়ন্ত্রণের জন্যে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান রোজা পালনকে অনন্য প্রতিষেধক হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। এক কথায় মানব জীবনে রোজা পালনের সামাজিক, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক অপরিহার্যতা অনন্বিকার্য।

এবার গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের শানে লিখিত মোকার অনুকূল চন্দ্রের কবিতা এবং ভাবার্থ প্রকাশ করে হ্যরত কেবলার জীবন দর্শন সম্পর্কে তাৎপর্যময় উপস্থাপনা প্রকাশ করা হয়েছে। কবিতায় বর্ণিত ঘটনায় গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর্যামী শক্তি স্পষ্ট করা হয়েছে। ২২শে চৈত্র ৫ই এপ্রিল মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে গাউসুল আয়ম বিল বিরাসাত হ্যরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবাজান কেবলা আলমের বার্ষিক উরস লক্ষ লক্ষ ভক্ত-আশেকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলম

মাইজভাণ্ডারী তুরিকার অন্যতম দিকপাল হিসেবে স্থীকৃত। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের ভাতুপ্পুত্র হওয়া সত্ত্বেও কঠোর ইবাদত, সিয়াম সাধনা, পাহাড়-পর্বত, সাগর, গিরি, খন্দক পরিভ্রমণ করে তিনি রিয়াজতের এক বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের বেসালের পর ছায়াভাবে তিনি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে অবস্থান গ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁর নির্বাক জীবনচার তাসাওউফ জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলে নতুন কৌতুহলের সৃষ্টি করে। তাঁর জীবনধারা, ইশারা ইঙ্গিতপূর্ণ কার্যকলাপ, হস্ত প্রসারিত করে পানি নিস্ত করার ঘটনা, পবিত্র চোখ-মুখের অভিব্যক্তির কারণে সাধারণ মানুষের নিকট তিনি ‘অবাক বিস্ময়’ তাক লাগানো ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী স্বয়ং তাঁকে নিজ বাগানের ‘গোলে গোলাব’ আখ্যায়িত করে মর্যাদা নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ভক্ত-আশেক পরিমণ্ডলে তিনি ‘মওলা রহমান-নুরে রহমান’ লয়ে দ্বন্দ্যতত্ত্বে স্মরণে মরমে জরী থাকেন। তাঁর পবিত্র উরসে মহান আল্লাহ সৃষ্টির সকলের প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষিত করুন এই প্রার্থনা করি।

এবারের আলোকধারায় ‘তায়কেরা-এ চেরাগে উম্মতে আহমদী’ মাহফিলে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের গাউসিয়া হক মনজিলের সম্মানিত সাজাদানশীল এবং এস জেড এইচ এম ট্রাস্টের মাননীয় ম্যানেজিং ট্রাস্ট রাহবারে আলম হ্যরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ ছাপা হয়েছে। এই ভাষণে তিনি ইসলাম ধর্মে রাজনীতির গাইডলাইন, রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা এবং ইসলামের নামে রাজনীতির পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। এই ভাষণে তিনি ইসলাম ধর্মের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গ তুলে ধরে ইসলাম ধর্মের আলোকে মানব ভাতৃত্ব গড়ে তোলার হেকমত স্পষ্ট করেছেন। নিয়মিত কলাম হিসেবে বেলায়তে মোত্লাকার সারানুবাদ, উম্মুল মুমিনীনদের জীবনী পরিচিতির শেষপর্ব, আহলে বাইতে রাসুল (দ.)'র তাসাওউফ জগৎ: হ্যরত হোসাইন ইবনে আলী (রা.) ছাপা হয়েছে। মানব সৃষ্টি সম্পর্কে বিতর্কিত বার্তা পরিহারের সুবিধার্থে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে পবিত্র কোরআনের ঘোষণাসমূহ উপস্থাপন করে সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হ্যরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)'র খোত্বা এবং টীকাভাষ্য, সুফি মাকাম পরিচিতি নিয়ে দেহতন্ত্র, আয়নায়ে বারী, একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ, মহিলা মাহফিল, শিশুতোষ প্রভৃতি নিয়মিত কলামের পাশাপাশি ভূমিকম্প সম্পর্কে আল কোরআনের বাণী উল্লেখ করে নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকধারা প্রকাশ করা হয়েছে।

আলোকধারা প্রচলিত অর্থে তাসাওউফ সম্পর্কিত পত্রিকা নয়। এটি আল কোরআন, হাদিস শরিফ, খোলাফায়ে রাশেদিন এবং সাহাবায়ে কেরামসহ আউলিয়ায়ে কেরামের পবিত্র জীবনচারের আলোকে মাইজভাণ্ডারী দর্শন, বেলায়তে মোত্লাকা এবং তাওহিদে আদ্বৈয়ান সম্পর্কে ধারণাগত সত্য স্পষ্ট করার মুখ্যপত্রও বটে। আমরা আমাদের মিশনের সফলতার জন্যে মহান আল্লাহ রাবুল আলামিনের রহমত কামনা করি। আমরা আমাদের এই কাজে সহযোগিতা চাই তাওহিদপন্থী সকল মানুষের। আমিন।

তাজকেরা-এ চেরাগে উম্মতে আহমদী মাহফিলে

রাহবারে আলম হ্যরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)

ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবন বিধান, আর তাওহীদে আদ্বয়ান

হচ্ছে বিশ্বজনীন ঐক্যের দিকনির্দেশনা

বার্তা পরিবেশক

১লা মাঘ, ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মাইজভাণ্ডার শরিফ শাহী ময়দানে তাজকেরা-এ চেরাগে উম্মতে আহমদী মাহফিলে সমবেত আশেক ভক্ত এবং তাজকিয়া সদস্যদের উদ্দেশ্যে রাহবারে আলম হ্যরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) মুসলিম উম্মাহ এবং আদম জাতির ঐক্যের লক্ষ্যে তথ্য-তত্ত্ব সমৃদ্ধ শুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। আলোকধারার পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উক্ত ভাষণ ছবছ প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক

আলহামদু লিল্লাহি রাকিল আলামিন। ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সায়িয়দিল মুরসালিন, ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। গাউসিয়া হক মন্জিল কর্তৃক আয়োজিত ‘তাজকেরা-এ চেরাগে উম্মতে আহমদী (দ.) মাহফিল ২০২৩’-এ উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, আলোচকবৃন্দ, উপস্থিত আশেকানে মোস্তফা (দ.), আশেকানে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী, আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। উপস্থিত আছেন দূর-দূরান্ত থেকে আগত মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির আশেকবৃন্দ, অত্র এলাকার পাঁচ পাড়ার অধিবাসীবৃন্দ, মাদ্রাসা-এ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী’র শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ। আমরা জানি যে ছবছুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর মহান উরস মোবারক ১০ই মাঘ সমাগত। সেই মহান বরকতময় উরস মোবারকের বারাকাত, নেয়ামাত যাতে সকলে লাভ করতে পারে, অংশগ্রহণ করতে পারে, সেই নেয়ামাতের ভাগীদার হতে পারে তারই জন্যে গাউসিয়া হক মন্জিল কর্তৃক কিছু কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছে। এটি এক সময় ১০ দিনব্যাপী থাকলেও এখন ১২ দিনব্যাপী একটি অনুষ্ঠানমালায় পর্যবসিত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন দিককে সম্পৃক্ত করে তুরিকতের আদর্শ অনুশীলনের লক্ষ্যে ছাত্র-শিশু-কিশোর-শিক্ষক

উলামায়ে কেরাম, মহিলা মহল এভাবে সকলকে সম্পৃক্ত করে কর্মসূচিগুলো প্রণীত হয়েছে। যার চূড়ান্ত ক্ষণ, প্রধান দিবস মহান ১০ই মাঘে লক্ষ মানুষের মিলনমেলার ভেতর দিয়ে এই অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি হবে ইনশাআল্লাহ। এই অনুষ্ঠানমালায় আপনাদের সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অংশগ্রহণের জন্যে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই অনুষ্ঠানমালারই একটি অংশ হিসেবে আমরা আজকে ১লা মাঘ ছবছুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র বেলাদত দিবসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আমরা সৌভাগ্যবান-আমাদের ডানে ছবছুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর রওজা মোবারককে আমরা পেয়েছি, বামে ছবছুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর ছজুরা শরিফ- দোয়ার মেহরাবকে পেয়েছি, সামনে গাউসুল আয়ম বিল বিরাসাত বাবা ভাণ্ডারী কিবলা আলমের রওজা শরিফকে আমরা পেয়েছি, বাবা ভাণ্ডারী কিবলা আলমের ছজুরা শরিফকে আমরা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এবং আরও একটু ডানে যদি আমরা যাই- অছিয়ে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর মাজার শরিফকে পেয়েছি, শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার মাজার শরিফকে আমরা পেয়েছি। রওজা মানে ফুল বাগান। অসংখ্য ফুলের সমাহার, শ্রেষ্ঠতম সেই ফুল বাগানে আমরা অবস্থান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ ওয়া তায়ালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি- আলহামদুলিল্লাহ।

আমি শুরুতেই একটি সুসংবাদ দিয়ে আজকের এই তাজকেরা মাহফিল শুরু করতে চাই। আমরা আনন্দের সাথে লক্ষ্য করেছি, জানতে পেরেছি- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ছজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর তুরিকার একজন সেবক, গাউসুল আয়ম বিল বিরাসাত হ্যরত বাবা ভাণ্ডারী কিবলা আলমের একজন মহান আশেক, তাওহীদের একান্ত-একনিষ্ঠ একজন প্রচারক রমেশ শীলের জীবনী পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভু এবং উনার লিখিত একটি শে'র সেই পাঠ্যক্রমের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত

এবং তাঁর পরিচিতি এবং সেই পরিচিতি মূলে হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর দরবারের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য জাতীয় পাঠ্যক্রমে সন্নিবেশ করায় গাউসিয়া হক মন্জিল, শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্ট-এর পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তনয়া/কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আশা করছি সামনে হ্যুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী শরিফও জাতীয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং তাঁকে অন্তরের অন্তর্ভুক্ত থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁর দীর্ঘ জীবন, সুস্থিত্য এবং তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেন আরও এগিয়ে যেতে পারে তাঁর জন্য পরম করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ করছি। এবং যে সমস্ত সংকটগুলো মোকাবেলায় উনি চেষ্টা করছেন সেই সংকটগুলো যাতে দূরীভূত হয়ে যায় আল্লাহ রাবুল আলামিন সেই তাওফিক উনাকে দান করুন।

আজ ইসলামের মহান খলিফা খোলাফায়ে রাশেদিনের অন্যতম একজন সৈয়দেনা আবু বকর সিদ্দিক (রাদি.)'র পবিত্র উরস মোবারক। উম্মাহর ক্রান্তিগ্রন্থে তাঁর অপরিসীম খেদমত উম্মাহকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। এই মহান হাস্তীর প্রতি অন্তরের অন্তর্ভুক্ত থেকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আজ ১লা মাঘ একই সাথে গাউসুল আয়ম বিল বিরাসাত বাবা ভাণ্ডারী কিবলা আলমের আওলাদ হযরত শাহ সুফি সৈয়দ সামগ্রুল হৃদা মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উরস মোবারক। তাঁর রওজা মোবারকে সালাম পেশ করছি। এটি হযরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর রহস্যই যে- এই মাঘের সাথে যুক্ত হয়েছেন হযরত শাহ সুফি সৈয়দ শফিউল বশর মাইজভাণ্ডারী। ৮ই মাঘ উনি বেসাল নিয়েছেন। এবং ১লা মাঘ বেসাল নিয়েছেন শাহ সুফি সৈয়দ সামগ্রুল হৃদা মাইজভাণ্ডারী। হযরত কিবলা আলমের এই ১০ই মাঘের সাথে বাবা ভাণ্ডারী কিবলা আলমের আওলাদে পাকগণকে যেন যুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। একইভাবে আমরা দেখি- হযরত কেবলা আলমের আওলাদ বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কিবলা কাবা বেসাল নিয়েছেন ২৬ আশ্বিন। পূর্বে ২৭ আশ্বিন গাউসুল আয়ম বিল বিরাসাত বাবা ভাণ্ডারী কিবলা আলমের খোশরোজ মোবারক উদযাপিত হতো। ঠিক তার আগের দিন শাহানশাহ বাবাজান বেসাল নিয়েছেন। এইভাবে হযরত

কিবলা আলমের আওলাদকে যেন বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের খোশরোজ মোবারকের সাথে সম্পৃক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এটি একটি রহস্যময় অবস্থা। আমি আশা করছি, অপূর্ব এই সম্মিলনকে সম্ভব করেই আমরা যাতে সামনে তুরিকতের খেদমতে সকলে এগিয়ে আসতে পারি। সকলে যার যার অবস্থান থেকে এই সম্মিলনের রহস্যকে সামনে রেখে নিজ নিজ অবস্থান থেকে তুরিকতের খেদমতে যেভাবে খেদমত করে চলেছেন, আরও ব্যাপকতা নিয়ে খেদমতে শরিক-শামিল থাকবেন- ইনশাআল্লাহ। শুধু তাই না, আমরা দেখেছি- উম্মুল আশেকিন মা মুনাওয়ারা বেগমও আশ্বিনেরই সাথে যুক্ত হয়ে আছেন। তিনি ২১ শে আশ্বিন বেসাল নিয়েছেন।

যাই হোক। হযরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর তাজকেরা মাহফিল দীর্ঘ সময় পরে হলেও হ্যুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর শাহী ময়দানে এ মাহফিল গাউসিয়া হক মন্জিল এন্ডেজাম করেছে। এবং এই মাহফিলে সমবেত হতে পেরে, উপস্থিত হতে পেরে, আয়োজন করতে পেরে আমি নিজেকে অবশ্যই সৌভাগ্যবান মনে করি। মূলত আপনারা জানেন- বিশ্বালি শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী হ্যুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর তুরিকতের এক মহান ধারা হিসেবে খোদায়ী রহমত বিলিয়েছেন সারা জীবন ধরে। নিজে অনাহারে-নির্দ্রা পরিত্যাগ করে খোদায়ীভাবে নিবেদিত থেকেছেন এবং মানুষের অফুরন্ত কল্যাণের উৎস হয়েছেন- আধ্যাত্মিক, জাগতিক, নৈতিক সর্বদিক দিয়ে। যার ফলশ্রুতিতে জগতে উনাকে আল্লাহ রাবুল আলামিন শাহানশাহ লকবে ভূষিত করেছেন, পরিচিত করিয়েছেন। এই মহান অলির পরিবার এবং আশেক ভক্তের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করেছি, আমরা আমাদের সমস্ত অযোগ্যতা দিয়ে সেই মহান খেদমতের ঐতিহ্যকে, তুরিকার খেদমতের ঐতিহ্যকে লালন করার, কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার- যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এ কল্যাণের ভাগীদার হতে পারে, অংশীদার হতে পারে, সাথী হতে পারে। শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে দীর্ঘসময় পূর্বে। বিশ্বালি শাহানশাহ হক ভাণ্ডারীর আশেকবৃন্দ, গাউসিয়া হক মন্জিল এবং এই ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছে। গাউসিয়া হক মন্জিলের মাধ্যমে, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটির সারা দেশব্যাপী যে শাখাগুলো রয়েছে- কমিটিগুলো রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে এই কর্মসূচি বিস্তৃত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। শিক্ষা খাতে, স্বাস্থ্য খাতে, দারিদ্র্য বিমোচন খাতে, দক্ষ মানব সম্পদ খাতে এই ট্রাস্ট তার ভূমিকা রাখার

চেষ্টা করেছে। একটি আলিম মাদ্রাসা, কয়েকটি এতিমখানা গড়ে তোলা হয়েছে।

এর মধ্যে একটি উম্মুল আশেকিন মা মুনাওয়ারা বেগম (এর নামে)- যেটি আমরা আগেই করেছি এবং সম্প্রতি আমরা আরেকটি এতিমখানাকে উম্মুল আশেকিন সৈয়দা সাজেদা খাতুনের নামে নামকরণ করেছি। ইনশাআল্লাহ্ আমরা সেটিকেও একটি মডেল এতিমখানা রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করব- ইনশাআল্লাহ্। কারণ আমরা দেখেছি দাদীজান সৈয়দা সাজেদা খাতুনের নামে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। আমার কাছে মনে হয়েছে এটি হওয়া উচিত। এজন্য আমরা একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করছি উনার নামে। তাঁর নাম পাক থেকেই যেন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার নেপথ্যে তাঁর অবদানগুলো মানুষ জানতে পারে, জাতি জানতে পারে, নব প্রজন্ম জানতে পারে। উনি অছিয়ে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর সহধর্মীনী ছিলেন এবং গাউসুল আয়ম বিল বিরাসাত বাবা ভাণ্ডারী কিবলা আলমের কন্যা ছিলেন। অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্ট পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ একটি বৃত্তি তহবিল গঠিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। ১৩টিরও অধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু আছে। এবং এটিকে আরও বৃহত্তর পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চেষ্টা চলছে। এবং এই খেদমতকে শুধু মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই খেদমতকে সকলের জন্যে উন্নত করে দেওয়া হয়েছে। সকলের সহযোগিতার জন্যে এই ট্রাস্টের এই সামান্য খেদমত। এই খেদমতটুকু গাউসিয়া হক মন্ডিল থেকে হয়েছে। কোন সুনামের জন্য নয়, মূলত আল্লাহ্, আল্লাহ্ রাসুলের সন্তুষ্টি এবং হ্যুমান গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর ত্বরিকার, দর্শনের আদর্শ, খুশবো যাতে নানান পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্য থেকেই এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে পারে এই লক্ষ্য থেকেই ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে। যাকাত তহবিল ট্রাস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। যার আওতায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো চলছে, সফলভাবেই চলছে- আলহামদুলিল্লাহ। যাঁরা এ সমস্ত খেদমতের সাথে যুক্ত আছেন, মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি এবং এই ট্রাস্টের নানান পর্যায়ে যাঁরা খেদমত করছেন- আপনারা সকলের জন্য দোয়া করবেন।

আজকে আমি শুধু এইটুকুই বলব যে- হ্যুমান গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর ত্বরিকাকে নিয়ে, শুধু তা-ই নয়- সার্বিকভাবে আউলিয়ায়ে কেরাম এবং মাজার কেন্দ্রিক যে ত্বরিকত চর্চা

এগুলো নিয়ে এক ধরনের ভুল বুঝার একটি পরিস্থিতি আমরা অনেক সময় সমাজে লক্ষ্য করেছি। যেখানে আমরা দেখেছি হ্যুমান গাউসুল আয়ম একদিন বলেছেন, জীবনী শরিফে আছে যে- জুমার সময় হয়ে গিয়েছে, লোকজনকে উনি বলেছেন- তোম লোগ খোদা কো ভুল কর হামারে পাছ কিউ- অর্থাৎ খোদাকে ভুলে তোমরা আমার সাথে কেন রয়ে গেছ? অর্থাৎ জুমাতে যাওয়ার উনি তাগিদ দিয়েছেন। আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদেরকে ডাকেন আল্লাহ্ পথে, আল্লাহ্ দিকে। শিক্ষা দেন তাওহিদের, দর্শন করেন আল্লাহ্-মুখী রাস্তার। কিন্তু সেই ভক্তিমুখী, ভাবমুখী, প্রেমমুখী সেই অবস্থানকে অপবাদ দেওয়া হয় পীর পূজা হিসেবে- নাউজুবিল্লাহ্। শিরীক, বিদআতের চর্চা হিসেবে- নাউজুবিল্লাহ্। এটি এক সময় একটি অবস্থায় থাকলেও এখন নতুন একটি পর্যায় নিয়েছে। আমরা দেখেছি যে, নানানভাবে মাজারগুলোর ব্যাপারে একটি Wrong Perception সমাজে বিরাজ করছে। আমরা যারা মাজার শরিফকে নিয়ে ত্বরিকত চর্চায় সম্পৃক্ত আছি তাঁরা খেদমত করছেন- মানুষ হিসেবে ভুল-ক্রটিও থাকতে পারে। কিন্তু খেদমতগুলো হাই-লাইট করার চাইতে, অবদানগুলো হাই-লাইট করার চাইতে কোথায় কোন পাগল কী করেছে বা কে কোন বাড়াবাড়ি করেছে ব্যক্তিগতভাবে সেটিকে হাই-লাইট করে পুরা আল্লাহ্-র আউলিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁর মাজার শরিফের কর্মকাণ্ডগুলোকে বিতর্কিত করা হয়। প্রথমেই আমি বলব যে, এর বিরুদ্ধে বা এর বিপরীতে যে কাজগুলো হওয়া দরকার ছিল হয়তো যথোপযুক্তভাবে হয়নি বলেই এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এই বিষয়টি। কিন্তু আবার কিছু মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব গ্রন্থ ইন্টারেস্ট-এর কারণেও এ সমস্ত অপপ্রচারগুলো প্রচারিত হতে দেখা যায়। আমার মনে হয়েছে এই জায়গায় কাজ করা দরকার। যাতে আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি ভক্তি, তাঁদের প্রতি প্রেম আরও বেশি জাগ্রত হয়। তাসাওউফের যে সমস্ত কালচার রয়েছে এগুলো হচ্ছে তাওহিদের অনুকূলে কর্মসূচি। এগুলো তাওহিদ বিরোধী কর্মসূচি নয়। এই বার্তাটি সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন আছে, আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়ার আছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। মাজার শরিফগুলো থেকে সামাজিক, মানবিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি আরও বাড়ানো দরকার বলে আমার মনে হয়েছে। তাহলেই আমরা এই পরিস্থিতি থেকে হয়তো নিষ্ঠার পাব। কারণ এটির পেছনে একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্র, একটি গ্রন্থ, কিছু মতবাদ

কাজ করে থাকে। মানুষকে সারাক্ষণ ভুল বুঝিয়ে থাকে। আমরা জেনেছি যে- বিভিন্ন নাটক, সিনেমায় মাজার শরিফগুলোকে এবং মাজার কেন্দ্রিক একজনকে বাবা বানিয়ে তাকে নেতৃত্বাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। আমি মনে করি- এই নেতৃত্বাচক প্রচারণা আমাদেরকে এড্রেস করা দরকার। অর্থাৎ আমি আবারও বলছি- এই যে মাজার কেন্দ্রিক যে বিশাল কর্মসূচি সারা দেশে, সারা বিশ্বে- এর মধ্যে কোথাও কেউ কোনদিন ভুল করবে না এটি তো বলা যায় না। কিন্তু সেটিকে পুঁজি করে পুরো আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি তাঁদের শান-আয়মতের প্রতি এবং তাসাওউফের যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতি যারা বিলুপ্ত করতে চায় তাঁরা মূলত ইসলামের সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করতে চায়, ইসলামের শিক্ষাকে বিলুপ্ত করতে চায়, ইসলামের ভবিষ্যত নির্মাণের পথ, মুসলিমদের ভবিষ্যত নির্মাণের পথকে তাঁরা রূপ্দ্ব করতে চায়। কারণ তাসাওউফে ইসলামই হওয়া উচিত বিশ্ব মুসলিমের পথেরখানা নির্মাণের প্রধানতম হাতিয়ার। হবে কিনা আল্লাহ্ রাকুল আলামিন জানেন। এটি যদি না হয় তাহলে আমরা সারাক্ষণ শুধু মুসলিমদের মধ্যে সংঘাত, পারস্পরিক সংঘাত আমরা দেখতে পাব- পারস্পরিক বিরোধ দেখতে পাব। কারণ আমরা দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, মুসলিম উম্মাহ দুইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি হচ্ছে, আমরা বিচারকের জায়গা থেকে সরে গিয়েছি। আমরা যা-ই বিচার করি- নিজেদের স্বার্থে বিচার করতে কীভাবে যেন আমরা শিখে গিয়েছি। আমি যখন সব ব্যাপারে শুধু নিজের স্বার্থে বিচার করব, তখন আমি আসলে ভাল বিচার করতে পারব না। ভাল সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। এবং সবার জন্য উপকারী সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছাতে পারব না। তখন আমার মুরুবিয়ানার জায়গা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আমাকে সরে যেতে হবে। এটি আমরা দেখেছি। দুর্ভাগ্যবশত এই চিন্তাগুলো প্রথমত অন্তর্ধর্ম সিদ্ধান্তের ভেতরে এসেছে, এরপরে আন্তর্ধর্ম- Intra Religious যে Connectivity তার ভেতরে কাজ করেছে। ইসলামের ভেতরে নানান গ্রহণ আছে। গ্রহণ থাকতেই পারে- একেক জনের ফোকাস একেক দিকে। একেক জনের ফোকাস একেক দিকে থাকতেই পারে- একেকজন একেক দিকে হাই-লাইট করে কাজ করেন। সেগুলোতে যারা ইন্টারেস্টেড তাঁরা সেখানে সমবেত হন। কিন্তু সেই গ্রহণগুলোর ভেতরে সাংঘর্ষিক একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে আমরা যেভাবে নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করে চলেছি- সেটি আরেকটি পর্যায়ে আমরা উপনীত হয়েছি। যেখানে একজন মুসলিমের রক্ত একজন মুসলিমের জন্য হারাম,

সেখানে আমরা দেখেছি যে- ইয়েমেনে মুসলিমরাই মুসলিমদের রক্ত নিয়েছে এবং নিচেছ। এবং ইরাকে আমেরিকার যে বোমারুগুলো বোমাব করেছে সেই প্লেনগুলো মুসলিম রাষ্ট্র থেকে উড়ে গিয়েছে। এবং সেখান থেকে তেল রিফুয়েলিং করেছে। কাজেই আমাদের ভেতরকার পারস্পরিক মতভেদের জায়গাটা ঠিক করা দরকার। বিচার আল্লাহ্ রাকুল আলামিনের হাতে, আমরা শুধু প্রচার করব। আমাদের নিজস্ব বুৰু-ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রচার করব। কিন্তু সব বিচার যেন আমরা পৃথিবীতেই করে ফেলতে চাই। আখেরাতের জন্য আমরা কোন বিচার রেখে যেতে চাই না। এই পরিস্থিতি- এই মানসিকতা আমাদের পরিবর্তন হওয়া দরকার। আরেকটা ক্ষতি আমাদের হয়েছে যে, ইসলাম হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক ধর্ম- আমি আগেও বলেছি। কিন্তু এখন এমন অবস্থা হয়েছে- ইসলাম আর রাজনীতি- Islam is equal to Politics- এরকম একটি অবস্থা বিশ্বব্যাপী হয়ে গিয়েছে। ইসলামের মধ্যে রাজনৈতিক একটি গাইডলাইন আছে। যেহেতু সামাজিক নীতিমালা আছে- সেই সামাজিক নীতিমালার আলোকে রাজনৈতিক গাইডলাইন অবশ্যই আছে- ‘একজন মুসলিম কী করে তাঁর রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা করবে’। But Islam as a religion is much more than politics. ইসলাম তো পলিটিক্স না। ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক দৈন্যতা নিরসনের জন্য এসেছে। আধ্যাত্মিক পুণ্যতা প্রদানের জন্য এসেছে। মানবিক চেতনাগুলো বিকাশের জন্য এসেছে। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ, ব্যক্তিগত এবং সামষিকভাবে কীভাবে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করা যায় তাঁর নীতিমালা দিয়েছে। কিন্তু রাজনীতির যে স্বত্বাব- রাজনীতির যে ডমিনেট করার একটি নিজস্ব স্বত্বাব আছে এবং এক ধরনের প্রতিপক্ষকে Annihilate করার, প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার একটি প্রচেষ্টা থাকে- Unfortunately আমরাও তার অনেকটা শিকার হয়ে গিয়েছি। ধর্ম জীবনে মুসলিম উম্মাহর ক্ষেত্রে আমরা তার শিকার হয়ে গিয়েছি। এ জায়গাগুলোকে এড্রেস করতে হবে। কী করা যায় এটি ভাবতে হবে। আমি জানি- এই কথাগুলো হয়তো একটা সেমিনারের কথা। এগুলো এই মাঠে বলার কথা না। তবে আমি এজন্যই বলছি, আমি দেখেছি- হজুর গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর অছি- অছিয়ে গাউসুল আয়ম কিন্তু শুধু দু- একটা পপুলার কথা বলেই একেবারে মোটা মোটা বই লিখে রেখে যেতে পারতেন। উনি সেই পপুলিস্ট পথে হাঁটেননি। উনি পপুলার হওয়ার, জনপ্রিয় হওয়ার সেই রাস্তায় হাঁটেননি। বরঞ্চ ওষুধ কিন্তু একটু তিতা হয়। আপনাকে ওষুধ খেতে হলে

একটু তিতা সহ্য করতে হবে। সারাক্ষণ শুধু মিষ্টি যদি চান-আপনাকে কিন্তু ডায়াবেটিস পেরে বসবে, ক্ষতি হয়ে যাবে। অছিয়ে গাউসুল আয়মও অত্যন্ত চাঁচা-ছেলাভাবে, স্পষ্টভাবে ইসলামের যে নীতিমালাগুলো আমাদেরকে পরস্পরের সাথে বেঁধে রাখবে এবং শুধু উম্মাহকে নয় সমস্ত মানবজাতিকে একসাথে বেঁধে রেখে সামনের দিকে সফলভাবে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে সেই ইসলামী দিক-নির্দেশনাগুলো উনি বেলায়তে মোত্লাকায় এনেছেন। ঐ যে বললাম, আমরা আসলে বিচারকের জায়গা থেকে বা আমাদের যথোপযুক্ত জায়গা থেকে সরে গিয়েছি- তাই এই দিক-নির্দেশনা এতটাই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে গিয়েছে যে এই কথাগুলো আমরা বুঝতেই পারছি না। এটা বুঝানো কষ্টকর হয়ে গিয়েছে। এবং ফলশ্রুতিতে আমরা দেখেছি- অত্যন্ত প্রত্যাখ্যানমূলক একটি অবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমরা দেখেছি, আনন্দের সাথে দেখেছি- যখনই আমরা এর একটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ (প্রকাশ করেছি), কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বেলায়তে মোত্লাকাকে দেখলে বুঝতে পারা যাবে এ ব্যাপারে যখন একটি পুস্তক আমরা প্রকাশ করেছি, কিছু পয়েন্ট আমরা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তখন আমরা দেখেছি যে- ঐ প্রত্যাখ্যানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আলহামদুলিল্লাহ্ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। অনেকেই বুঝতে পারছেন বিষয়টা। কানেক্ট করতে পারছেন। কারণ কানেক্ট করতে হবে তো। এইখানে একটা ডট আছে, এইখানে একটা ডট আছে, এইখানে একটা ডট আছে- এই সবগুলো ডট কানেক্ট করতে হবে। ইলেক্ট্রনিকের তার দেখেছেন? দুইটা তার যদি কানেক্ট করা না হয় তাহলে কিন্তু আলো জ্বলবে না। এখন যেহেতু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বলেন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা বলেন, আমরা ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরেছি। সরেছি কনফিডেন্স-এর সাথে বলছি এজন্যই, মুসলিম উম্মাহর ওভার অল যে কন্ডিশন, যে অবস্থা- এটি হচ্ছে আমাদের জন্য পরিচয় যে- আসলে ইসলাম থেকে আমরা মুসলিমরা যে উপকার পাওয়ার কথা ছিল, উচিত ছিল- সেই উপকার পেতে ব্যর্থ হয়েছি। না হলে তো মুসলিম উম্মাহর এই দশা হওয়ার কথা না। এই জন্য কনফিডেন্স থেকে আমি বলছি যে- আমরা সরে এসেছি। বেলায়তে মোত্লাকার যে বিশ্লেষণ- অছিয়ে গাউসুল আয়ম এই বিশ্লেষণটা এনেছেন গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশনা থেকে। এটি যতই অশ্রিয় হোক- সত্য কথা উনি বলেছেন, সত্য কথা লিখেছেন। এই জন্যেই আমি মনে করি যে- একটু হয়তো নিরস আলোচনা (হচ্ছে); আমি হয়তো

একটু উভেজনাকর আলোচনা করলে আপনাদের আরও ভাল লাগত। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে উভেজনাকর আলোচনার চাইতে চিন্তাযুক্ত আলোচনা এখন অনেক বেশি প্রয়োজন। সভ্যতার দিক-নির্দেশনা আছে, শান্তির দিক-নির্দেশনা আছে- যেই পথ অনুসরণ করলে ইসলাম থেকে যেই সুফল আমরা পাওয়ার কথা সেই সুফল আমরা লাভ করতে পারব- সেই পথ-নির্দেশনা আছে বেলায়তে মোত্লাকায়। আমাদের আরও বেশি মনোনিবেশ করতে হবে এই কিতাবের প্রতি। হ্যার গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর যে শান-আয়মত, এটি আমরা আসলে প্রকৃত অর্থে বুঝতে পারব বেলায়তে মোত্লাকা অনুশীলনের ভেতর দিয়ে। এটি আরও অনুশীলন করা দরকার আমার কাছে মনে হয়েছে। আপনারাও যাঁর যাঁর জায়গা থেকে চেষ্টা করবেন। আমরাও চেষ্টা করব। যেহেতু এটি একটি কনডেন্স বই; এটি একটি কনডেন্স বুক। অনেক তথ্য একসাথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে- সেহেতু এটি আমাদের বুঝতে একটু কষ্ট হয়। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্ অনুশীলনের ভেতর দিয়ে এটি এক সময় নিশ্চয়ই আমাদের বুঝের মধ্যে এসে যাবে। হ্যার গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর নজরে করম নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে আমাদের (সাথে) থাকবে- ইনশাআল্লাহ্। এটি কেন করব? এটি আমরা করব (কারণ)- আমাদের শুধুমাত্র উরস মোবারক করা, হাজির হওয়া উরসের দিনে- এর মধ্যেই হ্যার গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী আমাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করে দেননি। বেলায়তে মোত্লাকা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামের যে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি- সেই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে যাতে আমরা প্রয়োগ করতে পারি- তার জন্য হ্যার গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী তাগিদ দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা শুধু নিজেদের জন্য চিন্তা করলে হবে না, আমাদের সমাজের জন্য এবং বিশ্বজনীন একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। যেই রক্ত আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন, যাতে আমরা সেই রক্তের কদর করতে পারি, সেই রক্তকে ঠিক মতো উপস্থাপন করতে পারি তার জন্যে একটি প্রস্তুতির দরকার আছে। আমরা সেই প্রস্তুতির দিকে ইনশাআল্লাহ্ মনোনিবেশ করব আশা করি। এবং সামনের সময়গুলোতে আমরা সেই দিকেই নিজেদেরকে খেয়াল রেখে কাজ করব, কর্মসূচিগুলো সেভাবেই দেব। আমার মনে হয়েছে, ইসলামের যে বৈশ্বিক, আমাদের নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক যে সংকটগুলো হয়েছে এগুলোর একটি সমাধান বেলায়তে মোত্লাকার ভেতর আছে। আমাদের একটু কষ্ট তো করতে হবে, একটু যদি আমরা কষ্ট করি, একটু পরিশ্রম করি,

একটু মনোনিবেশ করি তাহলেই আমরা হ্যুর গাউসুল আয়ম
মাইজভাণ্ডারীর মিশনকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পারব
ইনশাআল্লাহ। অছিয়ে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী বলেছেন-
যদি তুলে ধরা যায় উপযুক্তভাবে- তাহলে বিশ্বের চোখ এই
দিকে ঘুরে যাবে। এবং আমরা দেখেছি তা-ই হয়েছে। আমরা
তুলে ধরতে পারিনি এটি আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু আমরা
দেখেছি- বেলায়তে মোত্লাকায় যে দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়েছে-
'তাওহিদে আদইয়ান'- আমরা দেখেছি এই যে ফুটবল
বিশ্বকাপ কাতারে শুরু হয়েছে- যেদিন শুরু হয়েছে- সোন্দিন
কুরআনুল করিমের যে আয়াত শরিফ পাঠ করা হয়েছে সেটি
হচ্ছে তাওহিদে আদইয়ানেরই, সেই আয়াত শরিফের
অনুকূলেই তাওহিদে আদইয়ানের মূলকথা নিহিত। অর্থাৎ
বিশ্ববাসী এখন বুঝতে পারছে যে, আসলে আমাদের ভিন্নভাবে
দেখার ব্যাপার আছে। আমরা যেভাবে দেখে এসেছি সেইভাবে
আসলে না দেখে একটু অন্যভাবে দেখার প্রয়োজন আছে। এই
যে বলে না- পেঁচার নয়ন আছে দিনে দেখে না। নয়ন
থাকলেই তো আসলে দেখে না। চোখ থাকলেই দেখে না।
দেখতে হবে। আমরা দেখতে ভুলে গিয়েছি। আমরা না শুধু-
উম্মাহরই এই অবস্থা হয়ে গিয়েছে। বেলায়তে মোত্লাকা
আমাদেরকে সেই চোখ ফেরত দিতে চায়। আমাদেরকে সেটি
গ্রহণ করতে হবে। গাউসিয়া হক মন্জিলের পক্ষ থেকে
আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

"(হে নবী!) বলুন, হে কিতাবিরা! এসো!
আমরা আমাদের কিতাবের অভিন্ন কথায়
একমত হই। (কথাটা খুব সহজ) 'আল্লাহ
ছাড়া কারো উপাসনা করব না। আল্লাহর
সাথে কাউকে শরিক করব না। আল্লাহ ছাড়া
কাউকে বা কোন মানুষকে প্রতিপালক বা
প্রভুরূপে গ্রহণ করব না।' যদি তারা এ
বিষয়ে একমত হতে না চায় তবে তাদের
সুস্পষ্টভাবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাকো,
অবশ্যই আমরা আল্লাহতে সমর্পিত হয়েছি"

- আল ইমরান : ৬৪।

"হে মানব মঙ্গলী! আল্লাহ তা'আলা জাহেলিয়া যুগের
সর্বপ্রকার অহমিকা, গর্ব চিরতরে দূর করে দিয়েছেন।
সব মানুষই আদম হতে, আর আদম মাটি হতে উৎপন্ন।
সব মানুষই আদম হতে সৃষ্টি, আদমের সন্তান; সুতরাং
সবাই পরস্পরের ভাই, সবাই সমান। অতএব তাকওয়া
(পরহেজগার) ব্যতিত অন্যকোন বিষয়ে কারো উপর
কারো প্রাধান্য নাই। যে অধিক মুস্তাকী সে-ই আল্লাহর
নিকট অধিক সম্মানিত। কারো সম্মানিত-অসম্মানিত
হ্বার এটাই মাপকাঠি"।

- বিদায় হজের ভাষণে বিশ্বনবী (দ.)'র আহ্বান

"ওহে জনতা! স্মরণ রেখ বাসভূমি, বর্ণ ও গোত্র
নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিম পরস্পর ভাই, এক
অবিচ্ছেদ্য ভাতৃ সমাজ এবং সম পর্যায়ভুক্ত। আজ হতে
বংশগত কৌলিন্য বিলুপ্ত করা হল। সে তোমাদের মধ্যে
সবচেয়ে কুলিন যে স্বীয় কার্যের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন
করে"।

- বিদায় হজের ভাষণ

"সাবধান! ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করবে না। ধর্ম
নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। কেননা ধর্মের সঠিক
বন্ধনসমূহ অতিক্রম করার ফলে তোমাদের পূর্বে বহু
জাতি ধূংস হয়ে গেছে"।

- বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)

"হে লোক সকল! অদ্য হতে মুসলমান অমুসলমান
নির্বিশেষে সকলের জন্যই সর্বপ্রকার মাদক-দ্রব্যের
উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। মুসলমানদের জন্যে
মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার পূর্বেই হারাম ঘোষিত হয়েছে।
এখন ক্রয়-বিক্রয় এবং উৎপাদনও নিষিদ্ধ হল। অদ্য এ
মহা বিজয়ের মহা সাফল্যের দিনে সবাইকে জানান দেয়া
হল, মাদক-দ্রব্যের উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ফৌজদারী
দণ্ডবিধির অন্তর্গত একটি গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত
হবে।"

- বিদায় হজে বিশ্বনবী (দ.)'র খোত্বা

"লক্ষ্য করো; একটি জানায়ার মিছিল দেখে মুহাম্মদ
(দ.) উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে বলা হলো, এটি তো
একজন ইহুদীর জানায়া। তিনি বলেন, এটি কি একটি
আত্মার আধার ছিল না, যা থেকে আমরা সতর্ক ও ভীত
হব?" - বিশ্বনবী (দ.)।

বেলায়তে মোত্লাকা : দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

খাদেমুল ফোকুরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) পবিত্র বাণী

খাদেমুল অলি হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিভিন্ন সময় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ভাবব্যঙ্গক উপদেশ দিতেন। যেমন: “আমার কাছে একটি পাটি বেতের বা ঘইস্যা ডাওলসের ফুলও কি নিয়ে আসতে পারো নি”। এই ফুলে থাকে একটুখানি মধু, যাতে রয়েছে পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা। এখানে তিনি এটাই বুঝাচ্ছেন যে, খোদেরা সততা, সরলতা এবং পবিত্র খোদাপ্রেম নিয়ে আসে না কোনো? যার বিনিময়ে তিনি তাদেরকে খোদায়ী ফজিলত দিতে আগ্রহাবিত। ('ঘইস্যা ডাওলস' কথাটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার। চট্টগ্রামের ভাষায় তিল গাছের মতো এক ধরনের ছোটো গাছকে ঘইস্যা বলা হয়। এতে তিল ফুলের মতো সাদা ছোটো ছোটো ফুল হয়। এটি মানুষের বহু ধরনের উপকারে আসে। পশুর চোখের ছানি আরোগ্য করে অর্থাৎ এই ফুল দিয়ে পশুর চোখের উপর ছানি পড়া বা আবরণ পড়াজনিত রোগ ভাল হয়। এই ফুলের কুঁড়িতে অল্প পরিমাণে মিষ্টি রস বা মধু থাকে। পাটি পাতার ফুলও ঐ রকম সাদা স্বচ্ছ এবং কুঁড়িতে স্বল্প পরিমাণে মধু থাকে।)

তিনি কাউকে কাউকে বলতেন: “ফেরেশতা কালেব বনে যাও”। অর্থাৎ ফেরেশতার মতো খোদার হৃকুম অনুসারে কাজ করো। অবাধ্য হয়ো না। কাউকে বলতেন: “কবুতরের মতো বেছে খাও। হারাম খেয়ো না, নিজ সন্তান-সন্ততি নিয়ে খোদার প্রশংসা করো”। যেরকম কবুতর বলে কোরআনের পরিভাষায়: “ওয়াক ওয়াবুম মরফুয়াতুন, ওয়াক ওয়াবুম মউদুয়াতুন”। অর্থাৎ এটি বেহেশতের নেয়ামতপূর্ণ বাটির প্রশংসা। কোনো কোনো সময় আইয়াম বীজের রোজা অর্থাৎ চান্দ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখগুলোতে উপবাস করে সংযম অবলম্বন করতে বলতেন। সময় বিশেষে কাউকে বলতেন: “তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ো”। কাউকে বলতেন: “সালাত-উত-তসবিহ এর নামাজ পড়বে, কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করবে”। এভাবে নফল ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করতেন; যাতে মানুষেরা পাপকাজ থেকে বিরত হয়ে মহান স্তুষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করতে অভ্যন্ত হয়। একদিন তাঁর হজরা শরিফে এক ব্যক্তি প্রবেশ করতে চাইলে তিনি হঠাৎ বলে উঠেছিলেন: “এখানে এসো না। এখানে ‘হাওয়া’ দাফন করা হয়েছে। এটি বাবা আদমের কবর”।

হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) উপরোক্ত উকিতে বুঝা যায় অনর্থক কাজ পরিত্যাগ না করে তার কাছে আসলে কোনো কাজ হবে না। যেহেতু ‘হাওয়া’ বা অনর্থক প্রবৃত্তিকে

এখানে দাফন করা হয় বা বিনষ্ট করা হয়। “এটি বাবা আদমের কবর” একথার অর্থ এটি বেলায়তে মোত্লাকার আদিপুরুষ অনর্থ বিনাশকারীর অবস্থানক্ষেত্র। যেমন কোরআন পাকে বলা হয়েছে: “যে কেউ খোদার কাছে উপস্থিতির সময়ের ভয়ে নিজ প্রবৃত্তিকে অনর্থক কাজ থেকে বিরত রাখে, বেহেশ্ত তার নিশ্চিত ঠিকানা”।^১ ফানা-ই-সালাসা অর্থাৎ ‘ফানা আনিল খাল্ক’, ‘ফানা আনিল হাওয়া’ এবং ‘ফানা আনিল ইরাদা’ এই তিনি ধরনের অবস্থা মানব কুপ্রবৃত্তির বিনাশকেই বুঝায়।

- ১) ফানা আনিল খাল্ক: কারো কাছে কোনো ধরনের উপকারের প্রত্যাশা না করাকে ‘ফানা আনিল খাল্ক’ বলে।
- ২) ফানা আনিল হাওয়া: মানব জীবনে যা নাহলেও চলে এরকম অনর্থক বস্তুকে পরিহার করে চলার নাম ‘ফানা আনিল হাওয়া’।
- ৩) ফানা আনিল ইরাদা: নিজের ইচ্ছার উপর খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দেয়াকেই ‘ফানা আনিল ইরাদা’ বলে। সুফি পরিভাষায় এটিকে রজা এবং তসলিম বলা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সূরা সাফ্ফাত-এর আয়াত ১০৩-এ (ওয়াতাল্লাহ লিল্ জাবিন)-এর ব্যাখ্যা তফসির-ই-ইবনে আরাবির দ্বিতীয় খন্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা রাগিব ইস্পাহানীর (মিশরে মুদ্রিত) লোগাত-ই-কোরআনী’র ৮৪ পৃষ্ঠায় যে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয়। মুখে ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে খোদার ইচ্ছার কাছে নিজ ইচ্ছা বা এরাদা’র বিলীনভাব, যা বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিশ্বাগ্রাম কর্তৃত সপ্ত-পদ্মতির তৃতীয় শুন্দি ব্যবস্থায় ‘ফানা আনিল ইরাদা’র রূপ প্রতীয়মান হয়। যার ফলে মানব চরিত্রে পাপ থেকে নির্বত্ত থাকার অবস্থা সৃষ্টি হয়।

এটি নবুয়তধনিষ্ঠ ব্যাপার হলেও বেলায়তের পর্যায়ভুক্ত। হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রবর্তিত সপ্ত-পদ্মতির মধ্যে অপর চারটি যথাক্রমে, ১) সাদা ২) কালো ৩) লাল ৪) সবুজ নিয়মযুক্ত দেহতত্ত্বমূলক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের উৎকর্ষমণ্ডিত বিধি-ব্যবস্থাগুলোতে ‘সালেক’ বা খোদা অভিমুখী পথচারীর জন্য বেলায়তে খিজরির স্তর পর্যন্ত উন্নীত করার সামর্থ্য রয়েছে বলে বুঝা যায়। এর ফলে বুঝতে কষ্ট হয় না

যে, তাঁর বেলায়ত পরম পর্যায়ে উন্নীত বেলায়ত। যাকে বলা যায়, হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর মতো পূর্ববর্তী বাধাযুক্ত বেলায়ত যুগের অবসানকারী, বাধাযুক্ত বেলায়ত যুগের অধিকারী, বেলায়তে মুহীতের মালিক, বেলায়তঘনিষ্ঠ খিজিরি বিধি-ব্যবস্থা সম্পন্ন বিষয়।

যে ভাবধারাকে উপরোক্ত সূরার আয়াত ১০৭-এ ‘বিজিবহিন আজিম’ বা জবেহ-শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করেছেন, আয়াত ১০৮-এ পরবর্তীগণের জন্য বহাল রইলো, আয়াত ১০৬ পরীক্ষামূলক এবং আয়াত ১০৫-এ ‘ক্ষাদসাদাকুতার রুইয়া ইন্না কাজালিকা ইয়াহজিল মুহসিনিন’ বলে উল্লেখ আছে, এর অর্থ ‘এখন তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। যেহেতু পুত্র হচ্ছে পিতার রহস্যের বিকাশোন্নুখের (উন্মোচনের) অপর নাম’।

এ কারণে এই গ্রন্থের এই পরিচ্ছদের শেষভাগে ব্যক্ত বর্ণনায় বুঝা যায়, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর উসুল বা মূলনীতি অনুসারে মানুষ জবাই বা বলিদান নিষ্ঠুরতা, অবৈধ ও অনিষ্টকর বলে বিশ্ব পালনকর্তার কাছে এটি অভিপ্রেত নয়। তাই কোরআনুল হাকিমে আল্লাহতায়ালা বলছেন, “এখন তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে যা চরম সৎকার্য।” এটাকে সুফি পরিভাষায় তসলিম ও রজা বলে।^২

মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.) বলেন: “ইলম বা জ্ঞানকে যদি দৈহিক প্রবৃত্তির উপর নিষ্কেপ করো, তাহলে তা অনিষ্টকারী সর্পই (সাপ, সরিসুপ) হবে। যদি প্রাণ-প্রেরণার উপর নিষ্কেপ করো তাহলে এটি সাহায্যকারী বন্ধুর মতো হবে”।^৩ কোরআন পাকের সূরা লোকমানের আয়াত ১৮-তে বর্ণনা আছে: “দুনিয়ার বুকে অহঙ্কারের সাথে পদক্ষেপ রেখো না”।^৪

ভারতীয় মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ‘শিক্ষা’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন: “বসনের পূর্বে ভূষণের সৃষ্টি”。 একথার প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে লিখেছেন: “আদিম আফ্রিকাবাসীরা দিন-দুপুরে এমনকি গ্রীষ্মকালেও বাঘের চামড়া গায়ে পরিধান করে পায়চারি করতে গৌরব বোধ করতো। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের শরীরে নানা ধরনের ছবি, সংকেত বা নিশানাদি খোদাই করে (উল্কি) রাখতে ভালবাসতো। দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাগণ মাছের কাঁটা ও শাঁখার অলংকার পরিধান করে অলংকার পরার সৌন্দর্য দেখাতো। শীতকালে শীতের কাপড় না পরে মৃত্যুবরণের মতো কষ্টকর ফ্যাশনকে আদর দেখিয়ে প্রমাণ করেছে যে, এই অসভ্য জনগোষ্ঠী গুলোই আদিম। ভূষণের সমাদর তাদের কাছে বেশি, সুতরাং ভূষণও আদিম বা প্রাচীন। এ কারণেই ‘ফ্যাশন’ সাধারণ মানুষের কাছে আদৃত।”

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে দেখা যায়, যে সব ‘ফ্যাশন’ শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে উপকারি তা পুণ্য বা সওয়াব হিসাবে ‘কামেল আচরণ’ বা সুন্নত হিসাবে পরিগণিত। আর যা, অনিষ্টকর ও অনর্থক তা গুনাহ বা পাপ এবং অনৈতিক-

অভিনব আচরণ বা ‘বেদাত-ই-সাইয়া’ বা অভিনব কুপ্রথায় পরিগণিত।

হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাঙ্গারী (ক.) অলংকার প্রথাকে ভালবাসতেন না। অনেককে তিনি শরীরের হাত, কান, নাক, ইত্যাদি অংশ থেকে অলংকার খুলে নামিয়ে রাখার জন্য হৃকুম দিতেন। এইসব অলংকারকে তিনি ‘বেড়ি’ (শৃখল) এবং ‘মনহস’ বা মন্দ আচার বলতেন। কারো নাক, কান ছেদন করতে দেখলে এবং এ কারণে কারো কান্না শুনতে পেলে তিনি নাক-কান ছেদনে বাধা দিতেন। এ বিষয়টি কোরআন পাকের সূরা নিসা’র আয়াত ১১৯ দ্বারা সমর্থিত।^৫

বর্তমান যুগে দেখা যায়, মানব গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ অলংক্ষে এক অনিষ্টকারী ফ্যাশনের অনুসারী হয়ে চলেছে।

পরিধানের জন্য নির্বাচিত অনিষ্টকারী নানা ভূষণ সমূহকে তারা সভ্যতা মনে করছে। যাকে কোরআনের পরিভাষায় নেশান্দ বিভোরচিত্ত হিসাবে অভিহিত করা চলে (আল কোরআন, সূরা হিজর, আয়াত ৭২)। যার পরিণাম বিপজ্জনক হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে এই ইসলামী সুফি সভ্যতা মানবজাতিকে পরিগামদশী, অনিত্য সম্পর্কে সচেতন, অনাসক্ত, খোদা-আসক্ত, সাম্যপ্রিয়, শান্ত, অল্লে সন্তুষ্ট করে, অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজনীয় পরিত্যাজ্য জীবন ছেড়ে দিয়ে নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যন্ত করতে সমর্থ এই ইসলামী সুফি সভ্যতা। এই ইসলামী সুফি সভ্যতা মানব গোষ্ঠী কর্তৃক অনুসৃত হলে বিশ্ববাসীর ধনসম্পদ সঞ্চয়ের মোহ এবং ধনসম্পদ কেন্দ্রীক জীবন ব্যবস্থা শিথিল হতে বাধ্য। এর ফলে ধনসম্পদ কেন্দ্রীক প্রতিযোগিতা হাস পাবে। কারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য খরচের আধিক্য বৃদ্ধির লালসাই মানব গোষ্ঠীকে অতি-রোজগার ও খাটুনির পথে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থায় মানব জাতি বিচার-বৃদ্ধি, ধর্ম-অধর্ম এবং এর পরিণামের কথা ভুলতে চলেছে, এবং ধনসম্পদের জন্য তাদের এই সর্বাত্মক প্রতিযোগিতা সমূহ প্রকারান্তরে হীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করছে, বিশ্বকে নিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত কামনার পথে, সর্বোপরি মানবজাতি এক বিপর্যয়ের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। অতএব হৃশিয়ারি ও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

সুফি সভ্যতার দিশারি

মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.)-এর মসনবি শরিফের মর্মবাণীতে আছে: “শেষ জমানার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে এই সুফিয়া-ই-কিরাম, যুগপ্রবর্তক অলিআল্লাহ্ এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনকারী লোকদের অনুসরণ করা একান্ত দরকার। যারা আত্মার প্রেরণাসম্মত চেতনায় সজাগ, তাদের সম্পদ বা বৈষয়িক চেতনা সুপ্ত। তাঁরা সুফি সভ্যতার আদর্শের দিশারি।”^৬

এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, পীরানে পীর হ্যরত শায়েখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-এর কথা, যিনি শরিয়তে মোহাম্মদের বিধান ধর্মের এবারত বা বহির্দ্বিতির বিরোধ যুগের নিয়ামক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা-প্রাধান্য যুগের

প্রবর্তক এবং অলৌকিকতায় জনপ্রিয়, যিনি বেলায়তে ওজমার অধিকারী। হ্যরত পীরানে পীর দস্তসীর (ক.) ‘ব্যবসা স্মার্ট’ উপাধিধারী হলেও নিজ মালবাহী জাহাজডুবিতে ও প্রচুর মুনাফাসহ বাণিজ্যতরি ফিরে আসার সংবাদের উভরে বলেছিলেন “আলহামদুল্লাহ্” অর্থাৎ খোদাকে ধন্যবাদ। খাদেমের প্রশ্নের উভরেও বলেছিলেন, “জাহাজ বা মালের জন্য নয়, বরং সুখ বা দুঃখের সংবাদে আমার অন্তঃকরণ খোদাতায়ালার স্মরণবিচ্যুত হয় নি বলেই “আলহামদুল্লাহ্” বলেছিলাম। কোরআন পাকে “লাতুল্হি হিম তিজারাতুন অলা বায়উন আন জিকরিল্লাহ্” একটি আয়াত বর্ণিত আছে। এর অর্থ হলো, “খোদার বান্দারা ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবারে এবং শাদি গমিতে খোদার স্মরণ থেকে বিচ্যুত হয় না”।

পারস্য দেশের একজন শিল্পীর শিল্পযোগ্যতা ও শিল্পে উৎসাহদানের জন্য অনেক অর্থমূল্য দিয়েও পীরানে পীর হ্যরত শায়েখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) একটি কার্পেট কিনতে ইতস্ততঃ করেন নি; যা সে সময়কার বাগদাদের একজন ‘খলিফা’ অর্থাৎ মুসলিম বাদশাহ অতিরিক্ত মূল্যের অজুহাতে কিনতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কেতাবী আহ্কাম ছাড়াও “এলহাম” ও “এলকা”-তে খোদার সাথে মানবের নৈকট্য এবং যোগাযোগের অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যা বৈষয়িক বৈরাগ্য ও খোদা অনুরাগীর পরিচায়ক। সম্পদ তাঁদের পদতলে লুঁষ্টিত হতে দেখা যায়; অথচ কি সম্পদ, কি বৈষয়িক সম্মানের জন্য তাঁরা অন্যের কাছে আনাগোনা করা থেকে বিরত থাকেন।

হ্যরত বু আলী কলন্দর (র.) দিল্লীর মুসলিম বাদশাহর উপহার ফেরৎ দিয়ে বলেছিলেন, “নিয়ে যাও, তোমার বাদশাহ একান্ত মোহতাজ ব্যক্তি। ফকিরের এতো জিনিসের প্রয়োজন নেই। তোমার বাদশা এই বিশাল রাজ্য ও সম্পদের অধিকারী থাকা সত্ত্বেও পররাজ্য জয়ে রক্তপাত কামনা করেন। তার ছোট দুঁটি চোখ অত্পন্থ। আমার অন্তঃকরণ কামনামুক্ত ও খোদার প্রতি সন্তুষ্ট”। খাতেমুল অলি হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) কুমিল্লার নওয়াব হোস্সাইনুল হায়দার প্রেরিত বহু উপহার ও টাকার স্তুপ লাঠির আঘাতে বিক্ষিপ্তভাবে ফেলে দিতে দেখেছি। লোকজনের আনা টাকা-পয়সা ও মালামাল অধিকাংশ, যখন তখন লোকজনের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন, কিছু অংশ মুসাফির ও পরিবার পরিজনদের জন্য ঘরে পাঠিয়ে দিতেন।

পূর্ব আজিমনগর নিবাসী মরহুম তমিজউদ্দীন মিএজাজির পুত্র কালা মিয়া বর্ণনা করেন, “আমি ছোট বয়সে একদিন হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) হজরা শরিফে গিয়ে দেখি যে, এই এলাকার কিছু লোক হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কাছে পরিধানের কাপড়, টুপি, ঘর মেরামত করার জন্য সহায়তা ইত্যাদি যে যার ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনা করছিল। দয়ার সাগর হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) হাজতি, মকসুদি লোকদের আনা টাকা-

পয়সা এবং বিভিন্ন সামগ্রী যে যেরকম চাইছিল তাকে সেরকমভাবে দান করছিলেন। আমিও উৎসাহিত হয়ে আমার মাথার টুপিটি কোমরের কাপড়ে গুঁজে রেখে বললাম ‘হজুর আমার টুপি নেই’। হ্যরত গাউসুল আয়ম (ক.) উভরে বললেন, ‘আমরা ছোটবেলায় ঘাটে খেলবার সময় বাতাস টুপি উড়িয়ে নিতে চাইলে তা নিজের কোমরে গুঁজে রাখতাম’। তাঁর মুখে একথা শুনে আমি লজিত হয়ে পড়লাম, তিনি আমার হাতে টাকা তুলে দিয়ে বললেন ‘এখন যাও’।”

হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর সহধর্মীনীকে বলতেন, “দুনিয়া মুসাফিরির জায়গা এখানে আড়ম্বরের দরকার কি”। হ্যরত আকদাস (ক.) আড়ম্বরপূর্ণ খুশী পছন্দ করতেন না। কেউ শাদি শব্দ উল্লেখ করে বিয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (দ.) এই জগতকে “দারুল হাজান” বা পেরেসানির স্থান বলেছেন, তুমি আমাকে খুশী শুনাতে এসেছ!”

মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রূমি (র.) বলেন, “ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত বাদশাহ, যিনি বাদশাহীর পরোয়া করেন না। চন্দ্র সূর্যের উপরও তাঁর আলো প্রভাবশালী”।^১ কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে হয়:

মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা।

তুমি বাদশার বাদশা কমলি ওয়ালা॥

অতএব প্রমাণিত হয় যে, এই বেলায়তে মোত্লাকার দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বানবতার জন্য স্রষ্টা অনুমোদিত শান্তিধারা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ধন-সঞ্চয় ও বন্টনে বা ধর্মকে চতুর জনেরা ব্যবসার রূপ দেয়ার ফলে যারা ধর্মবিমুখতা বা নান্তিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তাদের জন্য এটি একটি উভেজনাবিহীন পথ। এবং এই বেলায়তে মোত্লাকা বিশ্বানবতার জন্য কল্যাণধর্মের দিশারী। এটি ধনতত্ত্ব ও নান্তিকতাবাদের মূল উৎপাটনকারী, ধনসাম্যে উৎসাহ প্রদানকারী বিশ্শাস্তির প্রতীক।

পবিত্র কোরআনে ‘দুলাত’ অর্থাৎ অতিসঞ্চয়কে পছন্দ করা হয় নি। যেমন, কোরআন পাকের সূরা হাসরের সপ্তম আয়াতে আছে: “গনিমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে রসূলের (দ.) বন্টন মেনে নাও। তোমাদের মধ্যে ধনীদের অতিরিক্ত ধন সঞ্চয় হোক, আল্লাহ তা পছন্দ করেন না”।^১ এতে সাদা-কালো বর্ণবৈষম্য বা আঞ্চলিকতার কোনো প্রশ্ন নেই; বরং এটি সর্বজনীন ব্যবস্থা এবং সর্বহারাদের জন্য সুবিচারবাণী।

ইসলামী সুফি সভ্যতাই প্রকৃত কল্যাণকারী মানব সভ্যতা। যেহেতু এই সুফি সভ্যতার ধারকবাহক ব্যক্তিগণই অন্তরের ভেতরে-বাইরে পাক পবিত্রতাকামী ও অক্ত্রিম। তাঁরা অযথা সবকিছু পরিত্যাগকারী, তাঁরা অনাড়ম্বর জীবনযাপনের নির্দেশকারী, তাঁরা শুচিপূর্ণ আচার-আচরণের অভ্যাসকারী, তাঁরা পরশ্রীকাতরতা বিমুখ স্থানীয় জীবনযাপনে আগ্রহশীল, স্রষ্টা-ধর্ম উন্নুখ এবং ‘আমারা’ কামনা প্রবৃত্তিমুক্ত, সৃষ্টিকে যথাযথ ব্যবহারে ‘রহমান ও রহিম’ খোদার এই গুণজ

প্রকৃতিতে প্রকৃতিষ্ঠ। বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী খোদায়ী এই প্রাকৃতিক দানের অপব্যবহারের কারণে দুর্যোগ ও দুঃখ-কষ্টকে সম্পদের মোহে বাড়িয়ে চলছে, যার পরিণাম ভয়াবহ হওয়া স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে অপ্রয়োজনীয় কামনায় অসভ্য যুগের নির্দশনরূপী পরিধানের ভূষণকে ফ্যাশন মনে করে মানুষেরা অলঙ্কে অসর্তর্কর্তায় এই ফ্যাশনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেমন শরীরের সৌন্দর্যের জন্য অলংকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অলংকার পরিধানের জন্য নিজের শরীরের নানা অঙ্গে ছেদনের কষ্ট বরণ করা, নিজের হাতে, পায়ে ও গলায় নানা অলংকার পরিধান করা। আদিম আফ্রিকানদের মধ্যে গ্রীষ্মকালে দিন-দুপুরেও বাঘের চামড়া গায়ে পরিধান করে গর্ব ভরে বিচরণ করার রেওয়াজ ছিলো। অঙ্গ বিকৃতকারী আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদ, অনিষ্টকারী আমোদ, চরিত্র বিনষ্টকারী প্রমোদ এবং স্বাস্থ্যহানিকর পানাসক্ততা ও বেশভূষা হচ্ছে ‘বালা’ বা অকল্যাণ বিশেষ।

অযৌক্তিক আচার, ধর্ম ও মোহ, নোংরা ও স্বাস্থ্যবিনাশী হালচাল মানবতার ধর্মকে কলুষিত করে, এ কারণে আচারে-বিচারে অজ্ঞতাজনিত গর্ব ও অহমিকার বিকাশ পায়। পবিত্র কেরানে যাকে ‘মারহান’ বা উৎফুল্ল এবং ‘ফাখুরান’ বা গর্বকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে এর মধ্য দিয়ে মানব প্রকৃতি কঠিন ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠার কারণে মানব আত্মার কোমলগুণ বিলুপ্ত হয়ে ‘আম্মারা’ কামনা প্রবৃত্তি তার অন্তরে প্রধান্য বিস্তার করে মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানবিবর্জিত পশুসূলভ অসভ্যে পরিণত হতে বাধ্য করে। তাই এই পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে হলে ধর্মে আনুগত্য অপরিহার্য। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই ইসলামী সুফি সভ্যতা বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণকামী নির্ভরযোগ্য মানবীয় সভ্যতা। বিশ্বমানবতার কাঙারী হ্যরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এই সুফি সভ্যতার রহস্যের ধারক ও বাহক। সুফি সভ্যতার দিশারী মহাপুরুষদের যে বিশ্বারাণ কর্তৃত, তা স্রষ্টার প্রেমজ মৃত্তিতে মৃত্ত এবং দুর্নীতি নিবারণ ও বিশ্বারাত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থ।

যেহেতু মহানুভবতাই মানবতা, এই মহানুভবতার অপর নাম মানুষের সূক্ষ্ম স্রষ্টাবোধ শক্তি। এই স্তুল দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বের প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, সূক্ষ্ম পরমাণুর অপর বিকশিত নাম ‘অনু’। এই অনু’র ক্রমবিকাশই হচ্ছে বন্ধ, পদার্থ, উজ্জিদ, বীজ ও কীট। এই স্তুদ্র কীটের নৃতনত্বই হচ্ছে জীব, পশু, এবং শ্রেষ্ঠরূপ মানুষ। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, আদতে সূক্ষ্ম শক্তিই মূল।

স্তুদ্র বালুকা কণা যেমন দর্পণ বা আয়না হওয়ার যোগ্যতা রাখে ঠিক তেমনি এই মাটিতে তৈরি মানবও সূক্ষ্মশক্তি সদগুণ সম্পন্ন ফেরেশতার মতো আনুগত্যের স্বভাব সম্বলিত সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে; কখনো মানুষ সূক্ষ্মশক্তি বিমুখ, স্তুল পারিপার্শ্বিক প্রভাবযুক্ত নেতৃত্বাচক দ্বন্দ্বিক প্রকৃতির হয়ে উঠতে পারে ব্যক্তি ও পরিবেশের দ্বারা। আবার এই মানুষই ব্যষ্টিপ্রভাব বা স্বত্রস্বভাব শক্তিসম্পন্ন স্রষ্টার গুণজ দর্শনযোগ্য শক্তিশালী

জীব হয়ে উঠতে পারে। পালনকারী, বর্ধনকারী হচ্ছেন পরম সূক্ষ্ম আল্লাহ, এটি এই পরম সভার গুণজ বিষয়। তাই এই গুণজ মহাশক্তির শক্তিতে আত্মবিকাশকেই বলে ‘ইরফান’, যাতে মানবসৃষ্ট সাফল্যের নির্বাণ বা বিলয় ঘটে। কর্মক্ষেত্রে দেখা যায়, এই সূক্ষ্ম শক্তির ধ্যান-ধারণার সাধক সুফি মনীষীরাই অল্পে সন্তুষ্ট, আত্মনির্ভরশীল, নির্বিলাস ও সত্ত্বজি বা সৎ উপায়ে অর্জিত উপার্জন সম্পন্ন। তাঁরা অনর্থ বা উপকারবিহীন বিষয়-আশয়কে এড়িয়ে চলে। তাঁরা অন্যের দোষ দেখাকে পরিহার করে এবং নিজের দোষ-ক্রটির ব্যাপারে থাকে সজাগ, তাঁরা অহমযুক্ত (আমিত্ব বা অহমিকামুক্ত), তাঁরা স্রষ্টা অনুগত। ফলে সুফি মনীষীরা হয়ে উঠেন মূর্খ-যুগাচারমুক্ত ও পশুত্ব বিবর্জিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনকারী নিষ্কাম প্রেমজ গুণে গুণান্বিত মূর্তি ও বিশ্বপ্রেমিক। এ ব্যাপারে ঐশ্ব মহাপবিত্র কোরআনের প্রজ্ঞাবাণী সূরা হাদী’র ১৬ ও ১৭ আয়াতের ইঙ্গিত দ্রষ্টব্য। তাই পীরানে পীর দস্তগির হ্যরত শায়েখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) বলেছিলেন, “আমি ধর্মের পুনর্জীবন দানকারী। ‘এলহাম’ ও ‘এলকা’র দ্বারা মানবধর্মকে বেলায়তের আলোকিত করে বিধান ধর্মের বিরোধাত্মক খারাপ বিষয় (খারাবি) দূর করে পুনর্জীবনদাতা হিসাবে এসেছি”।

অতএব পীরানে পীর হ্যরত শায়েখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) প্রথম গাউসুল আয়ম যিনি বেলায়তে মোকাইয়্যাদা বা শৃংখলিত বেলায়তের সূচনাকারী (এফতেতাহিয়া)। কারণ তাঁর সময় মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদী শরিয়ত বলবৎ ছিলো। কারণ এই সময়টাতে মুসলিম হুকুমতের প্রাধান্য বিরাজমান ছিলো। গাউসুল আয়ম হ্যরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাওরী (ক.) বিকাশ লাভ করেন ১২৪৪ হিয়রিতে। তাঁর আগমন ঘটে ‘সুফিজম’ বা ‘সুফিবাদ’ নামে ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডারী পীর নামধারী সম্প্রদায়ের মন্দ কর্মকাণ্ড (খারাবি) দূরকারী হিসাবে এবং বিশ্বের বিধান ধর্মের শৈথিল্যপূর্ণ যুগের অবসানে বেলায়তে মোত্তাকা-ই-আহমদির বিশ্বারাণ কর্তৃত্ব নিয়ে।

এই প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, নবুয়ত জমানার পর আচার-ধর্মের প্রাধান্যের যুগে হ্যরত শায়েখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীই (ক.) নবুয়ত পরবর্তীকালের দীর্ঘতার অজুহাতে স্তুত মতবিরোধ যুগের অবসান ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন: “সমস্ত খোদাপ্রেমিক বন্ধুগণ আমার পদাক্ষ অনুসরণকারী, আমি পূর্ণচন্দ্ররূপী নবীর পদাক্ষ অনুসরণকারী”। এই দাবি প্রমাণ করে যে, মানবতার বিকাশ ক্ষেত্রে এটি সাম্যের একটি বৃহত্তম যোগ্যতার দ্বার উন্নোচনকারী, যা আগকর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বে গাউসে আয়মিয়তের দ্বার উন্নোচনকারী বেলায়ত। এই ঘোষণাকে অভিহিত করা যায় নবুয়ত ও বেলায়তের যুগল যোগ্যতা সম্পন্ন। এরপর শৈথিল বিধান-ধর্মের যুগে এই যুগল যোগ্যতা, ব্যক্ত (প্রকাশিত) ‘জাহের’, অব্যক্ত (অপ্রকাশিত) ‘বাতেন’ ইলম, ইলহাম ও

অলৌকিকতার প্রভাবে বিশ্বজনীন বেলায়তে মোত্লাকা হিসাবে বিকাশ লাভ করে। যার প্রেক্ষিতে গাউসুল আয়ম হ্যরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেছিলেন, “রসূলে করিম (দ.) এর দুটি টুপি’র মধ্যে (বেলায়তি সম্মানের দুটি তাজ বা শিরোভূষণ) একটি আমার মাথায় অপরটি আমার বড় ভাই পীরানে পীর দণ্ডগীর হ্যরত শায়েখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর (ক.) মাথা মোবারকে প্রতিষ্ঠিত। তাই বিশ্বের অন্য কোনো খোদাপ্রেমিক ব্যক্তি এই গাউসে আয়মিয়তের দাবি করেন নি, কিংবা অন্য কারো জন্য এই দাবি তুলেন নি। এর দ্ব্যথাহীন কারণ হলো, বেলায়তের সম্মানের এই প্রতীক আখেরি নবী (দ.) এর নবুয়তী নাম মুহাম্মদ এবং বেলায়তী নাম আহমদ-এর সম্মানের প্রতীক হিসাবে অভিহিত ছিলো। কবি তাই লিখেছেন:

শত কলমে একটি সূর্য এমনিভাবে ঝুলে
দো-জাহানের বাদশা আজি ফকির বেশে চলে।

অতএব, এই বেলায়তে মোত্লাকা, বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণধর্মের দিশারী পরম ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন। তার কারণ, বিশ্ব সভ্যতা যেভাবে কামনা-বাসনা, অনর্থ-অপচয়ের স্তরে এসে পৌছেছে, তার থেকে মুক্তির জন্য এই সুফি সভ্যতার সপ্ত-পদ্ধতির নীতিমালা অনুসরণ অপরিহার্য।

পবিত্র কোরআনের বাণী: “তোমরা ধ্বংসের নিকটবর্তী হলে খোদাতায়ালা তোমাদেরকে রক্ষা করেন এবং পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন”।^{১০} (সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৩) এ বিষয়টিকে কোরআন পাকের ভাষায় ‘আদলে মোত্লাক’, বিশ্বের মানবজাতির পরিভাষায় বিশ্বসাম্য এবং মানব সমাজের আইন-শৃঙ্খলার পরিভাষায় বিচারসাম্য বলা হয়ে থাকে। ওহে! বেলায়তে মোত্লাকার মশালধারী নৈতিকতার মহাপুরুষ! বর্তমানে অতি সঞ্চয়ের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে মোহাচ্ছন্ন মানুষের দিশারী হিসাবে তোমার আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে আসো। কাফেলা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। এ পেছনের কাফেলার ক্ষীণ আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। ওহে অহিংস নীতির বাহক! তুমি তো নৈতিকতাপূর্ণ আধুনিকতাকে হিংসা করো না। অতএব বিধানধর্মের বেড়াজাল ঠেলে সামনে অগ্রসর হও। ওহে! নির্বিলাস পরশ্রীকাতরতামুক্ত কামনাহীন মোজাদ্দেদে জয়ন! তুমি কামনা-বাসনামুক্ত খোদাতায়ালাতে সন্তুষ্ট অলিয়ে কামেল। তোমার রুহানি তসরুরোফাতের প্রভাবে ধাঁধায় পড়ে থাকা মানুষের অন্তর-চক্ষু উন্মিলিত করে কল্যাণের অন্তর্জীবন লাভে সহায়তা করো।

ওহে! পরমতসহিষ্ণু ধৈর্যশীল শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষাকারী ‘সায়েম’ খাতামুল অলি। ওহে! সংগ্রহ কবলমুক্ত জিতেন্দ্রীয় মহাপুরুষ! তোমার অনাড়ম্বর, ফ্যাসাদ পরিহারকারী জীবনাদর্শকে মোহগ্রস্ত মানব সন্তানের সামনে তুলে ধরো। ওহে! পাপকার্য থেকে বিরতকারী, প্রতিশোধ বিমুখ গাউসুল আয়ম! হিংসা-নিন্দা, প্রশংসা বা লাভ-লোকসান তোমাকে বিচলিত করে না,

তোমাকে মহান খোদার স্মরণ থেকেও বিচ্যুত করতে পারে না। তোমার স্বাধীন ও মহান বেলায়তের ধর্জা হাতে তুমি কাফেলার অগ্রন্থায়ক হিসাবে অগ্রসর হও। তুমি তৌহিদে আদ্বীয়ানের ধারক এবং ধর্মসাম্যের পোষক। তোমার রহমত থেকে কেউই বঞ্চিত হবে না।

তুমি রসূলুল্লাহর (দ.) উত্তরাধিকারী অগ্রন্থায়ক হিসাবে উপস্থিত না থাকলে কেউই বাঁচতে পারবে না। তোমার উপস্থিতিই খোদার রহমত। আর এর সাক্ষী পবিত্র কোরআনুল করিম: “আন্তা ফিহিম”^{১০}

ওহে বিশ্বালি! আজ সমগ্র বিশ্ব বিপদগ্রস্ত, তোমার ফজিলতে রব্বানীকে কামনা করছে। তুমি দর্শন ও ফয়েজ-রহমত দানে আমাদের কৃতার্থ করো। গোলাকার পৃথিবীর বৃত্তে প্রদক্ষিণরত মানবসন্তানেরা তোমার পেছনে ঘূরে আসুক একজনের পর একজন করে সুশৃঙ্খল কাতারবন্দীভাবে।

সারানুবাদ: ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

তথ্যসূত্র ও টীকা:

১. আল কোরআন, সূরা আন্নাজেয়াত আয়াত ৪০-৪১
২. *কোরআন পাকের সূরা সাফ্ফাত-এর আয়াত ১০৩-এ (ওয়াতাল্লাহ লিল জাবিন)-এর ব্যাখ্যা তফসির-ই-ইবনে আরাবির দ্বিতীয় খন্ডের ৭৬ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা রাগিব ইল্পাহানীর (মিশরে মুদ্রিত) লোগাত-ই-কোরআনী’র ৮৪ পৃষ্ঠায় যে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয়।
৩. আল কোরআন, সূরা সাফ্ফাত-এর আয়াত ১০৫, ১০৬, ১০৭ ও ১০৮
৪. মসনবি শরিফ, মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.)
৫. আল কোরআন, সূরা নেসা আয়াত ১১৯
৬. মসনবি শরিফ, মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.)
৭. মসনবি শরিফ, মাওলানা আল্লামা জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি (র.)
৮. আল কোরআন, সূরা হাসর আয়াত ৭
৯. আল কোরআন, সূরা আল ইমরান, আয়াত ১০৩
১০. আল কোরআন, সূরা আন্ন নাফাল সহায়ক গ্রন্থ:
- ক. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাল্লান চৌধুরী অনূদিত

‘BELAYET-E-MUTLAKA’ (The Unchained Divine Relations or Unhindered Spiritual Love of God), ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭, প্রকাশনী: আঙ্গুমান-ই-মুত্তাবেয়িন-ই-গাউস-ই-মাইজভাণ্ডারী, চট্টগ্রাম।

খ. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, সংকলন ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ হারুন রশিদ, প্রথম প্রকাশ: জৈষ্ঠ্য ১৪২২/ মে ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বাংলাদেশ।

উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.) মোঃ গোলাম রসুল

আল্লাহ্ সুহবানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, “আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসুলদের পাঠিয়ে থাকি। কিন্তু অবিশ্বাসীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতঙ্গ করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নির্দর্শনাবলি ও যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেসবকে তারা বিন্দুপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে”। (সুরা কাহাফ-৫৬)”。 মহান রবের ঘোষণা হলো, “আমি সত্যসহ কোরআন অবতীর্ণ করেছি। আমিতো আপনাকে (বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবল সুসংবাদদাতা ও সকর্তকারীরূপে প্রেরণ করেছি। (সূরা বনী ইসরাইল- ১০৫)। কিন্তু বিশ্বনবী (দ.)-এর বিবিগণ সত্যকেই আঁকড়ে ধরেছেন। হৃদায়বিয়ার সন্ধির (৬ষ্ঠ হিজরী) পর হ্যরত নবী করীম (দ.) পত্রাবলি প্রেরণ করে দূর ও কাছের শাসকদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একটি চিঠি ইসকান্দারিয়ার রোমান বাতরিকের (Patriarch) নামেও ছিলো। আরবরা তাকে “মুকাওকিস” বলতো। প্রথ্যাত সাহাবী হ্যরত হাতিব বিন আবি কালতা (রা.) নবী করীম (দ.)-এর চিঠি নিয়ে মুকাওকিসের কাছে পৌছলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না। তবে হ্যরত হাতিব (রা.)-এর সাথে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করলেন। তখন সাহাবী হাতিব (রা.) ইসকান্দারিয়া থেকে চলে যেতে লাগলেন। তখন দু'টি কিবতী মেয়ে তাঁর সাথে দিয়ে দেয়া হলো এবং তাঁর পক্ষে থেকে তাদেরকে নবী করীম (দ.)’র খিদমতে পেশ করার কথা বলা হলো। মুকাওকিস একটি চিঠিও দিয়ে দিলেন। চিঠিতে লিখা হলো, “আপনার খিদমতে দু’জন মেয়ে প্রেরণ করছি। মেয়ে দু’টি কিতাবীদের মধ্যে মর্যাদার দাবীদার”।

মেয়ে দু’টির নাম ছিলো হ্যরত মারিয়া (রা.) ও সিরিন (রা.)। সেখান থেকে ফেরার পথে উভয়ই হ্যরত হাতিব (রা.)-এর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হ্যরত হাতিব (রা.) মদিনা পৌছার পর তাঁদেরকে নবী করীম (দ.) হ্যরত সিরিন (রা.)-কে হ্যরত হাস্সান বিন সাবিত (রা.)-এর মালিকানায় দিয়ে দিলেন এবং হ্যরত মারিয়া (রা.)-কে নিজে হেরেমে দাখিল করে নিলেন। ৮ম হিজরীতে তাঁর গর্ভে মহানবী (দ.)-এর সাহেবজাদা হ্যরত ইব্রাহীম (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭-১৮ মাস জীবিত থাকার পর ইন্দ্রিয় করেন। তাঁর ইন্দ্রিয়ে হ্যরত মারিয়া (রা.) খুব ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং নবী করীম (দ.)-এর চক্ষু মোবারকও

অঞ্চলতে পূর্ণ হয়ে গেলো।

ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (দ.) পবিত্র ক্ষীদের সাথে যে ধরনের ব্যবহার করতেন, ঠিক একই ধরনের ব্যবহার হ্যরত মারিয়া (রা.)-এর সাথে করতেন এবং তাঁকেও পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নবী করীম (দ.) বলতেন, “কিতাবীদের (মিসরের খ্রিস্টান) সাথে ভালো আচরণ করো। কারণ তাদের সাথে ওয়াদা ও বৎশ উভয় সম্পর্কই রয়েছে। তাদের সাথে বৎশের সম্পর্কের ধরণ হলো হ্যরত ইসমাইল (আ.)-এর মা এবং আমার পুত্র ইব্রাহীম (রা.)’র মা (উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত মারিয়া রা.) একই কওমের। প্রতিশ্রূতি বাচুক্তির ব্যাপার হলো তাদের সাথে চুক্তি হয়েছে”।

আল্লাহ্ পাক হ্যরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-কে সুশ্রী ও সুন্দর চরিত্র দান করেছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হ্যরত আয়েশা (রা.) বলতেন, “মারিয়া (রা.)-এর উপর যত ঈর্ষা আমার ছিলো, অন্য কারোর উপর তা ছিলো না”।

হাফিজ ইবনে কাহির (রা.) ‘আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ গ্রন্থে লিখেছেন, হ্যরত মারিয়া (রা.) অত্যন্ত পবিত্র ও নেক চরিত্রের মহিলা ছিলেন।

নবী করীম (দ.)-এর ইন্দ্রিয়ের পর প্রথম খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.) এবং দ্বিতীয় খলিফা হ্যরত ওমর (রা.) একইভাবে হ্যরত মারিয়া (রা.)-এর মর্যাদা বহাল রেখেছিলেন।

হ্যরত মারিয়া হ্যরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে ১৬ হিজরীর মহর্রম মাসে ইন্দ্রিয় করেন। হ্যরত ওমর (রা.) সকল মদিনাবাসীকে একত্রিত করে নিজে জানায়ার নামায পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে হ্যরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)’র উসিলায় হেদায়তের সঠিক বুৰু ও ইমানের মতো শ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্জন এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

১. পবিত্র কোরআন শরিফ,
২. দুইশত একত্রিশ জন মহিলা সাহাবী ও বেহেশ্তী রমণীগণ, মোসাম্মৎ আমেনা বেগম, ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা।
৩. ইমান-আমল-ইলম, ড. ইবনে আশরাফ, রিমবিম প্রকাশনী, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

রমজান : পরিচ্ছন্ন মিহতার সাধনা মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

মাসের সরদার

একদল পর্যটক যখন সমুদ্র সৈকতে হাঁটে কোনো একজনকে দেখা যায় সবাইকে পেছনে ফেলে অগ্রভাগে হাঁটছে। বাগানে কোনো এক বিশেষ চারাগাছে প্রথম ফুল ফোটে। বনে একটা গাছ সবগাছ ছাড়িয়ে আপন শির উঁচু করে। সময়ের সমুদ্র পাড়ি দেয়া বছরের কোনো মাসকে যদি অগ্রগামী পদচারী, প্রথম ফুল ফোটা চারাগাছ ও শির উঁচু করা বৃক্ষের সাথে তুলনা করতে হয় তাহলে রমজানের কথাই উল্লেখ করতে হয়। রমজান মাস ক্রম হিসেবে নবম কিন্তু মর্যাদার নিরিখে প্রথম। রমজান হচ্ছে মাসের সরদার, যেমন দিনের সরদার শুক্রবার। এ মাসের পূর্ববর্তী দু'মাসের মধ্যে রজব হচ্ছে আল্লাহর মাস, শা'বান হচ্ছে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আর রমজান হচ্ছে মু'মীন মুসলমানদের মাস। রমজানকে সম্মানিত করে সাধারণভাবে মানুষকে সম্মানিত করা হয়েছে। আল্লাহকে একক একমাত্র প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে যে মানুষ রমজানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে তার জন্যই উন্নুক্ত হবে সাফল্যের দুয়ার।

ক্রম অভিযাত্রা

সাফল্যের এ সোনালী তোরণে পৌছতে হলে আমাদের পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি প্রয়োজন। রজবে চলে এর বীজবপন, শা'বানে পরিচর্যা আর রমজানে ফসল ঘরে তোলার আয়োজন। তাই তখন থেকেই আল্লাহর একজন অনুগত বান্দার প্রিয় প্রার্থনা: “আল্লাহমা বারিক লানা ফি রজবা ওয়া শা'বান ওয়া বালিগনা ইলা শাহরে রামাদান”। অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ আমাকে রজব ও শা'বান মাসের বরকতে সিঞ্চ করুন এবং রমজান পর্যন্ত পৌছিয়ে দিন’।

বিশ্ব মানব সংস্কৃতি

রমজান বিশ্ব মানবতার ধারাবাহিক ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির যৌক্তিক ও ন্যায্য উপসংহার। যুগে যুগে মানবজাতির বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে রোজার বিধান জারি ছিল। তাই এটা ভুঁইফোড় কোনো অভিনব সংস্কৃতি নয়। এটা কষ্টকর কোনো বিধানও নয়। বরং মহান স্বীকৃতির নৈকট্য লাভের সংগ্রামে একটা সহজতম পদ্ধতি ও কার্যকর হাতিয়ার। রোজা পালনের মাধ্যমে একজন মুসলমান উপলক্ষ্মি করতে

পারে, সে এক সর্বব্যাপী সার্বভৌম প্রেমময় অভিভাবকের নিগৃত নিরাপত্তার বেষ্টনিতে সংরক্ষিত এক জীবসভ্য। সে বুঝতে পারে তার জীবন এলোমেলো পদবিক্ষেপে ছুটে চলা লক্ষ্যহীন কোনো স্নোতধারা নয়। তার একটি সুনির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যপূর্ণ অভিযাত্রা ও সে যাত্রার একটা সুস্পষ্ট অভিমুখ রয়েছে। বাস্তবেই সে বুঝতে পারে তার জীবনের এক চিরন্তন উৎস ও অনিবার্য এক গন্তব্য আছে। এ বোধ যখন জাগ্রত হয় চেতনার পার্শ্বদেশে তখন তার মুখে ধ্বনিত হয়ে ওঠে এক স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ “প্রভু আমি তোমার কাছে থেকে এসেছি এবং অবশ্যে ফিরে যাব তোমারই কাছে। জীবনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আমার সকল অপূর্ণাঙ্গতা সহ আমি ফিরে এসেছি তোমার কাছে তুমি আমাকে গ্রহণ করো।”

দেহ ও আত্মার সমন্বয় ও ভারসাম্য

মানুষ একাধারে দেহ ও আত্মার সমষ্টি। তার যেমন রয়েছে এক সুগঠিত ও সুসমঞ্জস দৈহিক কাঠামো তেমনি তার অভ্যন্তরে রয়েছে আত্মার স্ফুরণ। দেহের চাহিদাকে সে অতিক্রম করে যেতে পারে না যেমন, তেমনি পারে না আত্মার অনুশাসনকে তুঢ়ি মেরে উড়িয়ে দিতে। পার্থিব জগতে সে যেমন বিচরণ করে তেমনিভাবে তার পরিভ্রমণ চলে রূহানী জগতে। দেহ ও আত্মার চাহিদার মাঝে সে যদি না পারে ভারসাম্য রক্ষা করতে তাহলে তার জীবন হয়ে পড়ে একগুঁরে, একরোখা ও ধ্বংসপ্রবণ। সে তখন নিজেই হয়ে পড়ে নিজের শক্তি। সবচেয়ে সর্বনাশা বিষয় হচ্ছে এহেন অবস্থায় সে উপলক্ষ্মি করতে পারে না সে নিজেই নিজের কতটুকু সর্বনাশ দেকে আনছে। রমজান তাকে সূযোগ করে দিয়েছে দেহের অভিলাষ ও আত্মার অভিন্নার মধ্যে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার। জীবনে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা গেলে অর্জিত হয় শান্তি ও স্বত্ত্ব। আর ভারসাম্য বিনষ্ট হলে সৃষ্টি হয় বিপন্ন বিপর্যয়।

দু'টো অঙ্ককারের বিপরীতে দু'টো আলো

আল্লাহ দু'টো অঙ্ককারের বিপরীতে দু'টো আলো সৃষ্টি করেছেন। একটি হচ্ছে কবরের অঙ্ককার, দ্বিতীয়টি হাশরের অঙ্ককার। কবরের অঙ্ককারের বিপরীতে সৃষ্টি হয়েছে কোরআনের আলো আর হাশরের অঙ্ককারের বিপরীতে রমজানের আলো। অর্থাৎ কোরআনের আলো দূর করে কবরের অঙ্ককার। আর রমজানের আলো দূর করে হাশরের

অঙ্ককার। কবর ও হাশরের আঁধার হচ্ছে আঁধারের ওপর আঁধার। আর কোরআন ও রমজানের আলো হচ্ছে, আলোর ওপর আলো। নূরুন আলা নূর। তাই কোরআনের চর্চা ও রমজানের সাধনা হচ্ছে যুগপৎ ঘোরতর আঁধারের বিপরীতে অফুরান আলোর সন্ধান।

রমজানের উদ্দেশ্য তাকওয়া

এ বিপর্যয় থেকে সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন তাকওয়া অর্জন। ক্ষুৎপিপাসায় জর্জরিত হয়ে আত্মপীড়নের পটভূমি রচনা রমজানের অভিপ্রায় নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে তাকওয়া সৃষ্টি। তাকওয়া মানে আল্লাহ্ সচেতনতা। মানুষ যে অবস্থা ও অবস্থানে থাকুক না কেন সকল অবস্থানে তাকে থাকতে হবে আল্লাহ্ উপস্থিতি, তাঁর বিধি নিষেধ ও অভিপ্রায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনতা। কারণ সৃষ্টির কোনো কিছুই মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্ জ্ঞান, দর্শন, শ্রবণ ও কুদরতী শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও আওতার বাইরে নয়। মানুষকে মনে রাখতে হবে তার হাত পা চোখ কান জিহ্বা সবকিছু তার সকল কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। শেষ বিচারের দিনে এগুলো তার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। যার হৃদয়ে এ বিষয়টি জাহাত থাকবে তার পক্ষে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার সম্ভব নয়। আর এ সবের বেপরোয়া ব্যবহারে অভ্যন্ত ব্যক্তির জন্য রোজা হচ্ছে স্বেচ্ছ বিনা কারণে উপোষ্ঠ থাকার ভিন্ন নাম।

সংযম সাধনা

পৃথিবীতে কালো ও ধলো আছে। নেকী ও মেকি আছে। হারাম ও হালাল আছে। সিন্দ ও নিষিদ্ধ আছে। গতিক ও বেগতিক আছে। সরলতা ও গরলতা আছে। সর্বোপরি মানুষের এক প্রকার স্বাধীনতা আছে। বাছাই করার অধিকার আছে। তাহলে সে কি আঁধারের পূজারী হবে না আলোর দিশারী হবে? সে কি নেকীর অনুশীলন করবে, না দোসর হবে মেকির? সে যদি স্বীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার করে হারামের মাঝে পরিত্বিত খোঁজ করে তাহলে তার জীবন থেকে হালাল পিঠ ফিরিয়ে পালাবে। সে কি সিন্দকে দলিত করে নিষিদ্ধের পানে হাত বাঢ়াবে? তখন হাত যদি পুড়ে যায় কে দায় নেবে সে অঙ্গরের? সে কি গতিকে বেপরোয়া করে জীবনকে করে তুলবে বেগতিক? সে কি সরলতাকে অবলম্বন করে নিজের শীর্ষমুখী উথান ঘটাবে নাকি গরলতাকে আলিঙ্গন করে পাতালমুখী অভিযাত্রায় ধাবিত হবে? যে কোনো বাঢ়াবাঢ়ির উপযুক্ত প্রতিষেধকই হচ্ছে সংযম। রমজানের অন্যতম শিক্ষা হচ্ছে: সংযমী হও, করো সবর ইখতিয়ার। সবরকারীদের সাথী হচ্ছেন আল্লাহ্। আল্লাহ্ যার সাথী কোনো ভয় নেই তার। নেই

কোনো দুঃখ। না দুনিয়াতে, না আধিরাতে।

পরিশুন্দ জীবন

পরিশুন্দ জীবন চর্চার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে ও উপদেশ বিতরণে ফ্লান্তিবোধ করতে দেখা যায় না খুব একটা কাউকে। তবুও জীবন আমাদের গ্লানিমাখা। আমরা ভাগ করি পরিশুন্দতার, চর্চা করি নোংরামির। ভদ্রতার মুখোশ পরে মগ্ন থাকি ভঙ্গমীতে। যা করি তা বলি না, যা বলি তা করি না। পবিত্র কোরআন তাই আক্ষেপ করে বলেছেন: “কেন তোমরা তা বল, যা তোমরা নিজেরা করো না?” রমজানকে কেন্দ্র করে আমরা চাইলে সংযমকে সকল স্বল্পনের বিরুদ্ধে বর্ম বানাতে পারি। নোংরামি পরিহার করে নিতে পারি পরিশুন্দতার সবক, গ্লানিকে মুছে দিয়ে উজ্জ্বল করতে পারি জীবনের মহিমা, ভঙ্গমির কুটকৌশল ছিন্ন করে জীবনে আনতে পারি পরিচ্ছন্ন স্মিন্ধতা।

হাদিসে রাসূল (দ.)

“রাসূলে খোদা (দ.) কে জিজেস করা হল, ‘মানুষের সবচেয়ে বড় দোষ কী? তিনি উত্তর করলেন, আমার কাছে কখনো দোষ জানতে চেও না, গুণ জানতে চেও।’ এই বাক্যটি তিনবার বলার পর বললেন, জেনে রেখ, অসৎ বিদ্বান ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধম ও সৎ বিদ্বান ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম।”

“আল্লাহ্ সৃষ্টি সমস্ত প্রাণী সমন্বয়েই তাঁর (আল্লাহ্) পরিবার’ তিনিই সর্বাধিক প্রিয়, যিনি আল্লাহ্ সৃষ্টি প্রাণীদের সর্বাধিক কল্যাণ করে যান।”

“ক্ষুধিতকে অন্ন দাও, পীড়িতকে দেখাশুনা কর, অন্যায়ভাবে ধৃত বন্দিকে মুক্ত কর। মজলুমকে সাহায্য কর, সে মুসলমান বা অমুসলমান।”

আহলে বাইতে রাসুল (দ.)'র তাসাউফ জগৎ^১

অধ্যাপক জগত উল আলম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হ্যরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা.)

ঝঁর পবিত্র শোণিতের বন্দলায় এবং রক্তের বুনিয়াদে ইসলামের অমলিন আদর্শ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তিনি হলেন বিশ্ববী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)'র দৌহিত্র হ্যরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা.)। উমাইয়া শাসনের শুরুতে গোত্রীয় কর্তৃত্বের মানসিকতা এবং বংশতাত্ত্বিকতার অপছায়া প্রতিষ্ঠাপন করতে গিয়ে শাসকরা রাষ্ট্র এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনায় রোমান এবং পারস্য ধারা প্রবর্তনে তৎপর হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র গঠনশৈলী এবং সমাজ ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্ববাদ গড়ে তোলার স্বার্থে উমাইয়া শাসকদের মধ্যে শুরুতেই নৈতিক স্থলন এবং অঙ্গীকার অঙ্গীকার প্রবণতা তৈরি হয়ে ওঠে। জনমত এবং ইসলাম ধর্মের সুউচ্চ নৈতিকমান উপেক্ষা করে শক্তি প্রদর্শন ও পারিতোষিকতার প্রলোভন ছড়িয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে রাখার কুৎসিত কর্মকাণ্ডে সূত্রপাত ঘটলে মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম ধর্মের মৌলিক চেতনা ধূলিস্যাত হবার আলামত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ধরনের অমানিশা মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করতে থাকলে ইসলাম ধর্মে নতুন প্রাণ সৃষ্টিকারী অসীম সাহসী সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ এবং মুজাহিদ হিসেবে আবির্ভূত হন রাসুল (দ.)'র দৌহিত্র হ্যরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা.)।

সত্য এবং ন্যায় অঙ্গুল রাখার লক্ষ্যে বিশ্ববী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)'র পরম প্রিয় দৌহিত্র হ্যরত হোসাইন (রা.)'র কোরবানীকে স্মরণ করে তৃরিকতপন্থীদের উদ্দেশ্যে প্রথ্যাত দরবেশ ইলমে মারিফাতের উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষ হ্যরত আলী হাজবিরী দাতা গঞ্জে বখু (রহ.) লিখেছেন, 'হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) সমন্ত বিপদাপদ বরণকারীদের কিবলা এবং সর্দার ছিলেন। সমন্ত তৃরিকতপন্থী তাঁর হাল এবং সঠিকতা সম্পর্কে একমত। যখন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন তিনি ঐ সত্যের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু সত্য যখন তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, তখন তিনি অস্ত্র ধারণ করলেন এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় জীবন ধন-সম্পদ ও আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করলেন।'

ন্যায় নীতি বিচুত শাসক এবং এক শ্রেণির সমাজপতির সুবিধাবাদী কর্মকাণ্ডে ভীত সন্তুষ্ট অবস্থায় আত্মসমর্পণে প্রায় প্রস্তুত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিশ্ববী (দ.)'র অনুপম আদর্শের স্পৃহা জাগিয়ে তোলার নিমিত্তে সত্যের নির্দেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ কঞ্চে উম্মাহর অভ্যন্তরে অঙ্গজিহাদের প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধিতে আনেন হ্যরত ইমাম হোসাইন ইবনে আলী (রা.)। তাঁর এই মহান নীতি নিষ্ঠার বর্ণনায় সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হ্যরত খাজা সৈয়দ মঙ্গলুদীন চিশ্তি (ক.) 'দিওয়ান-ই মঙ্গলুদীন'-এর তিন নং রংবাটিতে উল্লেখ করেছেন,

"হে হোসাইন, যে কাজ আপনি আঞ্চাম দিয়েছেন, তা দিয়ে আপনি মোস্তফার ফুল বাগিচায় বসন্ত এনে দিয়েছেন, কোন পয়গম্বর যে কাজ করার সুযোগ পাননি, খোদার কসম, হে হোসাইন, আপনি সে কাজ সম্পন্ন করেছেন"।

ইসলাম ধর্মের মৌলিক ধারা এবং শিক্ষা জাগ্রত রাখার মানসে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র কোরবানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভারত উপমহাদেশের মুসলিম মনীষী বৃটিশ উপনিবেশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী মওলানা আবুল কালাম আজাদ 'যে সত্যের মৃত্যু নেই' গ্রন্থে 'কারবালার আদর্শ' নিবন্ধে উল্লেখ করেন- "কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত খোদার পথে যত আত্ম্যাগ ঘটেছে, তা ছিল নেহাত ব্যক্তিগত। মানে নবীগণ হয় নিজ সন্তানকে অথবা নিজকে খোদার পথে উৎসর্গ করতেন। এ ছিল জেহাদের প্রারম্ভ....আদিরূপ। কিন্তু তার পূর্ণতা ইসলামি সংবিধানে এসে দেখতে পাই। ইসলাম যেভাবে তার ভেতরে আকায়েদ, ইবাদত, জীবন পদ্ধতি এক কথায় ইহজাগতিক ও পারলৌকিক সর্বাধিক কল্যাণকর পদ্ধতির পূর্ণতা ঘটিয়েছে, অতীতের সব ধর্মের আংশিক ও অসম্পূর্ণ বিধান যে রূপ ইসলামে এসে পূর্ণরূপ লাভ করেছে, তেমনি জেহাদের পূর্ণরূপ ও ইসলাম আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এ পর্যন্ত কোনো পয়গম্বরের গোটা পরিবার কোনদিন জেহাদে অংশগ্রহণ করেননি।

শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও কেউ আত্ম্যাগ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, খোদা তাঁকে পথের মাঝেই থামিয়ে দিয়েছেন। হ্যরত ইবাহীম (আ.) প্রাণপ্রিয় সন্তানকে খোদার পথে উৎসর্গ করতে গিয়েও সুযোগ পাননি। হ্যরত সুসা (আ.) শুল্তে আত্মানের জন্যে এগিয়ে গেলেন। অথচ তাঁকে বাঁচিয়ে দেয়া হলো। এ পর্যন্ত কোন নবীর গোটা পরিবার একত্র হয়ে খোদার পথে আত্মাঞ্চল্য করার সুযোগ লাভ করেননি। এ পর্যন্ত কোন নবীর জীবনে দেখা যায়নি যে, শুধু পুত্র, স্ত্রী বা ভাই ই নয় বরং সবাই মিলে খোদার পথে আত্মান

ইয়াজিদের একনায়কত্ব মেনে নেবার জন্যে যারা হাত বাড়িয়েছিল, তারা ইসলামি খিলাফতের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। ধর্মের ভেতরে জিহাদ তো সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের মূলোচ্ছদের জন্যেই রাখা হয়েছে। তাই যখনই হ্যরত ইব্রাহীম (আ.)'র কোরবানীর আদর্শ বাস্তবায়নের সুযোগ এল, তখন নবী পরিবারের প্রত্যেক নর-নারী, শিশু ও কিশোর এক কথায় সবাই একযোগে অংশগ্রহণ করলেন। খোদার পথে কোরবানীর পুণ্য শোণিতে এ পর্যন্ত ধরণীর বুক রঞ্জিত হয়নি। ইসলাম এসে সে অপূর্ণতাও পূর্ণ করে দিল কারবালার রক্ত স্রোতের ভেতর দিয়ে।

সুতরাং হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র ঘটনা যেমন ব্যক্তিগত ঘটনা নয় তেমনি বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। এর সম্পর্ক শুধু ইসলামের ইতিহাসের সাথেই নয় বরং ইসলামের মূলরূপের সাথেই জড়িত। মানে, ইসলাম যেরূপ হ্যরত ইসমাইল (আ.)'র ভেতরে আত্ম প্রকাশ করেছিল এবং তা ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে হ্যরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত পৌছে আবার লোপ পেয়েছিল-তাকেই হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) নিজের মাথা বিকিয়ে পূর্ণ করে দিলেন।

পৃথিবীকে আবাদ করার জন্যে নবী পরিবার ধীরে ধীরে উজাড় হয়ে চলেছিল। হ্যরত ইব্রাহীম (আ.) দেশ ছেড়ে হিজরত করলেন, হ্যরত মুসা (আ.) ঘরবাড়ি ছেড়ে নীল দরিয়ায় পাড়ি জমালেন। হ্যরত ঈসা (আ.) সন্ন্যাসী হয়ে পালিয়ে ফিরলেন এবং হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)-এর পরিবার হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র নেতৃত্বে কারবালার ময়দানে সংসার উজাড় করার ব্রতটি পূর্ণতায় পৌছালেন”। আরাফাতের ময়দানে পৃথিবীবাসীর জন্যে উদাত্ত আহ্বানের পর গাদীরে খুম নামক স্থানে বিশ্বনবী (দ.) দুঁটি বিষয় পুনরায় সকলকে শ্মরণ করিয়ে দেন। এ দুঁটি বিষয় সম্পর্কে তিরমিজি শরিফ, কিতাবুল মানাকির হাদিস নং ৩৭৮৮ অনুযায়ী হ্যরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)'র বর্ণনামতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মহান প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তায়ালা আমাকে জানিয়েছেন যে, এ দুঁটি বস্তু কিয়ামতের দিনে হাউজে কাউসারে আমার নিকট না পৌছা পর্যন্ত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। প্রথমটি আল্লাহর কিতাব যা হেদায়ত ও নূরে পরিপূর্ণ। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে ধারণ কর এবং মজবুত করে আঁকড়ে ধর। দ্বিতীয়ত আমার আহ্লে বাইত। আমি আমার আহ্লে বাইত সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা শ্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার আহ্লে বাইত সম্পর্কে আল্লাহর কথা শ্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার আহ্লে বাইত সম্পর্কে আল্লাহর কথা শ্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। অতএব

তোমরা সচেতনতা অবলম্বন কর এ ব্যাপারে যে, আমার পরে এ দুঁটির সঙ্গে তোমরা কীভাবে আচরণ কর”। গাদীরে খুমে বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) পবিত্র কোরআন এবং আহ্লে বাইত সম্পর্কে বলেছেন, “এ দুঁটি বস্তু কিয়ামতের দিনে হাউজে কাউসারে আমার নিকট না পৌছা পর্যন্ত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না”। এখানে আল-কোরআনের পাশাপাশি আহ্লে বাইতের প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে অধিকতর তাৎপর্য বহন করে। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ উপর্যুক্ত বাণীর প্রতি দৃষ্টি রেখেই পৃথিবীকে আবাদ করার ব্যাপারে আহ্লে বাইতের অবিস্মরণীয় অবদান বর্ণনায় এনেছেন। এতে ইসলাম ধর্মের মৌলিকত্ব রক্ষা, নির্ভেজাল সততা, ন্যায়বোধ সমন্বয় রাখার লক্ষ্যে পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র পরিবারসহ কোরবানী প্রদান সবিশেষে উল্লেখের দাবী রাখে। ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদতের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের পুনঃপ্রাণ প্রাপ্তি সরাসরি সংযুক্ত বিষয়। হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র পবিত্র শোণিতের বদলায় উমাইয়া শাসকের দূর্বিপাক থেকে ইসলাম ধর্ম উদ্ধার হয়েছে। এ জন্যে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর উল্লেখ করেছেন, “ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি বাদ”। অর্থাৎ কারবালার মাধ্যমে ইসলাম জীবিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ নবী-রাসুল, পয়গম্বরদের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর জন্যে ওহীর ভিত্তিতে মানব সমাজে আল্লাহর অসীম অন্তিম ঘোষণা, তাঁর প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য প্রদর্শন সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে মানবের জীবনচার সম্পর্কে যে সকল শর্ত এবং বিধিবিধান সংযুক্ত করে আসমানী কিতাব এবং সহীফা নাজিল করেছেন এগুলোর সর্বত্রই ইসলামকে মনোনীত ধর্ম হিসেবে নামকরণ করেছেন। বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)'র মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল নবীদের নবুয়ত, কিতাব এবং সহীফাকে সত্যায়িত করে মহাগ্রন্থ পরম পবিত্র কোরআনকে সর্বশেষ আসমানী কিতাবের মর্যাদা দিয়ে আখেরী-নবীর সীল-মোহরের ভিত্তিতে ইসলামকে মানবজাতির জন্যে পূর্ণসং জীবন বিধান হিসেবে খোদায়ী মনোয়নের পরিপূর্ণতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আল-কোরআন হচ্ছে ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণ জীবন বিধান সম্পর্কিত অবিকৃত ঐশ্বী কিতাব। এই কিতাবের মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আল্লাহর রাহে স্বপরিবারে জীবন কোরবান দাতার নাম হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)। বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)'র পরম আদরের দৌহিত্র হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শুভ জন্ম চতুর্থ হিজরীর ৪ শাবান পবিত্র নগরী মদিনায়। তাঁর পিতা বেলায়তের সন্দ্রাট হ্যরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) এবং মাতা রাসুল (দ.)'র দুইতা খাতুনে জান্নাত হ্যরত ফাতিমা যাহরা (রা.)। হ্যরত

ইমাম হোসাইন (রা.)'র জন্য প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (দ.)'র আশেক আল্লামা নূর উদ্দিন আবদুর রহমান জামী (রহ.) ‘শাওয়াহেদুন নবুয়ত’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, “তাঁর (হ্যরত ইমাম হোসাইন) গর্ভকাল ছিল ছয়মাস। বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে দু'ব্যক্তিই মাতৃগর্ভে ছয়মাস থাকার পর জন্মগ্রহণ করে জীবিত রয়েছেন। একজন হ্যরত হোসাইন (রা.) অপরজন আল্লাহর নবী হ্যরত যাকারিয়া (আ.)”। ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ শুনে হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) দ্রুত কন্যার গৃহে ছুটে যান এবং নবজাতক দৌহিত্রের কানে আজান দেন। হ্যরত আলী (রা.) প্রিয় পুত্রের নাম দিয়েছিলেন ‘হরব’। বিশ্বনবী (দ.) নাম পালিয়ে রাখেন ‘হোসাইন’। তাঁর কুনিয়াত ‘আবু আবদুল্লাহ’। হ্যরত হোসাইন (রা.)'র দেহের বুক থেকে নিম্ন অংশের গঠন প্রকৃতি ছিল বিশ্বনবী (দ.)'র মতো। তিনি এমন সুশ্রী ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ছিলেন যে অন্ধকারে বসলে তাঁর কপাল ও গও থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে চারিদিকে আলোকিত করে দিত। হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) সম্পর্কে রাসুলে খোদা (দ.) বলেছেন, “যে হোসাইনকে ভালবাসে সে যেন আমাকে ভালবাসে। যে হোসাইনের সাথে শক্রতা করে সে যেন আল্লাহর সাথে শক্রতা করে”। রাসুল (দ.) উল্লেখ করেছেন, “হোসাইনের উৎপত্তি আমা হতে এবং আমি হোসাইন হতে। যে হোসাইনকে বন্ধু ভাবে আল্লাহ তাকে গ্রহণ করেন বন্ধু হিসেবে। হোসাইন আমার বংশধারার উজ্জ্বলবাতি”।

বিশ্বনবী (দ.)'র উপর্যুক্ত উক্তি বিষয়ে উম্মুল হারিস (রা.)'র বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায়, তিনি উল্লেখ করেন, আমি রাসুলুল্লাহ (দ.)'র খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম হজুর, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। এতে আমি ভীত হয়ে পড়েছি। হজুর (দ.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী দেখেছ? আমি বললাম: আমি দেখেছি আপনার শরীর থেকে একটি খণ্ড কেটে আমার কোলে রেখে দেয়া হয়েছে। হজুর (দ.) বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাতিমা একটি শিশু প্রসব করবে। সে তোমার কোলে থাকবে। এ ঘটনার পরে হোসাইন (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র শৈশবকালের ঘটনা। একদিন বিশ্বনবী (দ.) হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)-কে তাঁর পুত্র দান বাহুতে বসান। বাম বাহুতে বসান তাঁর পুত্র হ্যরত ইব্রাহীম (রা.)-কে। এমতাবস্থায় হ্যরত জিবরাইল (আ.) উপস্থিত হন। তখন আল্লাহর ফেরেশ্তা বলেন, “আল্লাহ তায়ালা দু'জনকে আপনার কাছে একত্রে থাকতে দেবেন না। তাঁদের একজনকে ফিরিয়ে নেবেন। এখন আপনি যাঁকে ইচ্ছা পছন্দ করে নেন। হ্যরত জিবরাইল (আ.)'র বক্তব্য শুনে হজুর (দ.) বলেন, “হোসাইন বিদায় নিলে তাঁর বিরহে ফাতিমা, আলী এবং আমার প্রাণ দক্ষ হবে। অন্যদিকে

ইব্রাহীম বিদায় নিলে তাতে আমার দুঃখ হবে”। হজুর (দ.) নিজের দুঃখ মেনে নেন। ঘটনার তিনিটি পর রাসুল (দ.) নদন হ্যরত ইব্রাহীম (রা.) ওফাত হন। মূলত দ্বীয় পুত্র হ্যরত ইব্রাহীম (রা.)-এর কোরবানীর বদ্লায় বিশ্বনবী (দ.) হ্যরত হোসাইন (রা.)-কে আপন সভায় জড়িয়ে নিলেন। শৈশবে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)'র পরম পুত্র স্নেহ-মমতায় বেড়ে উঠেছেন। শৈশবে যখনই হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) রাসুলে করীম (দ.) সমীপে আসতেন তখনই তাঁর ললাটে চুম্ব খেয়ে ‘খোশ আমদীদ’ বলতেন। এ পর্যায়ে বলে উঠতেন, “আমি এর জন্যে আপন পুত্র ইব্রাহীমকে বিসর্জন দিয়েছি”। হাসান-হোসাইনের শিক্ষা-দীক্ষার হাতেখড়িও নানাজী (দ.)'র সংস্পর্শে। মাতা-পিতার পাশাপাশি বিশ্বনবী (দ.)'র পরম নৈকট্য, নবী গৃহে মসজিদে নববীতে যে কোন সময় অবাধে গমনাগমনের সুযোগের কারণে হাসান-হোসাইন ভাতৃষ্যের অন্তঃজগতের চেরাগ জ্বলে উঠে মহান নানাজী (দ.)-কে ঘিরে। নবী গৃহে না পেলে উভয় ভাতা না দেখা পর্যন্ত খুঁজে বেড়াতেন নানাজী (দ.)-কে।

আওলাদে রাসুল, আহ্লে বাইত হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) এবং তাঁর অঞ্জ হ্যরত হাসান (রা.) শৈশবে প্রায়শ নবী করীম (দ.)'র সঙ্গে থাকতে ভালবাসতেন। অনেক সময় তিনি দৌহিত্রদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে বাইরে হাঁটাহাঁটি করতেন। এ ধরনের অভ্যাসের একদিন রাসুলুল্লাহ (দ.) প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়কে নিয়ে বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে ভ্রমণে বের হলেন। কিছুক্ষণ তাঁদেরকে নিয়ে এদিক ওদিকে ঘুরে ফিরে অবশেষে একটি খর্জুর বৃক্ষের নিচে উপবেশন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৌহিত্রদ্বয়ও তাঁর দু'পাশে উপবেশন করলেন। বসে রাসুলে খোদা (দ.) নাতিদের সঙ্গে নানা ধরনের খোশ আলাপ করতে লাগলেন। এ সমস্ত খোশ-আলাপ আলোচনার মধ্যদিয়ে তিনি স্নেহের দৌহিত্রদ্বয়কে নানারূপ মূল্যবান উপদেশ ও শিক্ষা দান করতেন। ঐদিন একবার কথায় কথায় তিনি প্রথমে প্রিয় কনিষ্ঠ নাতি হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, “হে প্রিয় নাতি, আমি যখন এ ধরাধামে থাকবো না, তখন যদি কেউ কখনও তোমার সাথে ঘোর শক্রতায় লিঙ্গ হয় অথবা অকারণে তোমাকে নিদারণ কষ্টের ভেতর দিন কাটাতে শক্তি প্রয়োগ করে তখন তুমি তার সাথে কীরূপ ব্যবহার করবে?”

শেরে খোদা হ্যরত আলী (রা.) এবং নবী দুইতা হ্যরত ফাতিমা (রা.)'র স্নেহের দুলাল হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) বলেন, “হে শ্রদ্ধেয় নানাজী, প্রথমবার আমি তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করব, দ্বিতীয়বারও আমি তার প্রতি প্রতিশোধ নেব

না। কিন্তু তারপরেও যদি সে আমার সাথে শক্রতা পোষণ বা অন্যায় আচরণ প্রদর্শন করে তবে আর আমি তাকে মার্জনা করব না। অত্যাচারী যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, যেখানেই সে লুকিয়ে থাকুক না কেন আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে প্রয়োজনে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বতও অতিক্রম করতে পিছপা হবো না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় আমি আমার জীবনের শেষ শক্তি দিয়ে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাবো।”

বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র এক্রপ তেজোদ্বীপ্ত উন্নত শ্রবণে মহাখুশি হলেন। অলঙ্ক্ষ্য তাঁর চক্ষুদ্বয় আনন্দাভ্রতে ভরে ওঠল। কী যেন তিনি গোপন রাখলেন। সন্মেহে প্রিয় নাতির পিঠে পবিত্র শীতল হন্তের পরশ বুলিয়ে বলেন, “হে আমার প্রিয় নাতি, ন্যায় সত্যের মূর্ত্প্রতীক তুমি ইসলামের অকুতোভয় সেবক শেরে খোদা হ্যরত আলী’র সুযোগ্য সন্তান। তুমি অশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে। মহান আল্লাহ্ পাক তোমার ন্যায়পরায়ণতা, সত্যনির্ণয় ও সৎ সাহসে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি তোমার সত্য নির্ণয় ও সৎ সাহসের পুরক্ষার পাবে। তোমারই বংশে ইমাম সৃষ্টি হবে। হে আমার নয়নের পুতলি, তোমার দ্বারাই রোজ কিয়ামত পর্যন্ত আমার বংশের ধারা অব্যাহত থাকবে।”

হাদীস শরিফে উল্লেখ আছে রাসুল (দ.) হ্যরত হাসান এবং হ্যরত হোসাইন (রা.)-কে অত্যধিক মেহ করতেন বিধায় প্রতিদিন তাঁদেরকে দেখার জন্যে নিয়মিতভাবে একবার হ্যরত ফাতিমা (রা.)'র গৃহে গমন করতেন। তাঁদেরকে ডেকে আদর সোহাগ করতেন এবং সাথে নিয়ে বিভিন্ন খাওয়ার জিনিস খাওয়াতেন।

একবারের ঘটনা। রাসুলে খোদা (দ.) মাগরিব অথবা ইশার নামাযের জন্যে মসজিদে নববীতে আসেন। তাঁর কোলে হ্যরত হাসান কিংবা হ্যরত হোসাইন (রা.) ছিলেন। নামায আদায়ের সময় হলে তাঁকে কোল থেকে নামিয়ে পাশে বসিয়ে রাখেন। বিশ্বনবী (দ.) জামাতের ইমাম হিসেবে নামায শুরু করেন। হজুর (দ.) যখন সিজদায় গেলেন, তখন দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে রইলেন। দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হবার পর এক সাহাবী মাথা উঠিয়ে বিষয়টি অনুধাবনে সচেষ্ট হলেন। দেখলেন শিশুটি সিজদারত নবী করীম (দ.)'র পিঠের ওপর চড়ে বসে আছেন এবং হজুর (দ.) সিজদা অবস্থায় রয়েছেন। বিষয়টি দেখে সাহাবী পুনরায় সিজদারত হলেন। নামায শেষে সাহাবীরা দীর্ঘ সময় সিজদায় থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে হজুর (দ.) বলেন, “কোন ওহী অথবা অস্বাভাবিক কারণে নয়, আমার নাতি আমার পিঠে চড়াও হয়ে বসেছিলেন। তাঁকে নামিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয়নি”।

একদিন বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) হ্যরত ফাতিমা (রা.)'র গৃহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় গৃহের অভ্যন্তর হতে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র কান্নার শব্দ শুনলেন। গৃহের নিকটে গিয়ে হজুর (দ.) স্থীয় কন্যাকে ডেকে বললেন, “ফাতিমা, তুমি জান না, ওদের কান্না শুনলে আমার কষ্ট হয়!” তিরমিয়ি শরিফে হ্যরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)'র বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, “কোন এক প্রয়োজনে রাতের বেলা রাসুল (দ.)'র কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি চাদরের ভেতরে কী যেন আবৃত রেখে বাইরে আসেন। আমি কথা শেষ করে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে রাসুল (দ.), আপনি চাদরে কী লুকিয়ে রেখেছেন?’ তিনি চাদর সরালেন। দেখা গেল ভেতরে শিশু হাসান ও হোসাইন রয়েছেন। হজুর (দ.) বলেন, এরা দু'জন আমার মেয়ের ছেলে। হে আল্লাহ্, আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি, তুমও এদের উভয়কে এবং এদের উভয়কে যারা ভালবাসে তাদেরকে ভালবাস’।

হ্যরত ইমাম হাসান এবং হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র নাম এতো নিবিড়ভাবে সংযুক্ত যে, সর্বসাধারণে নাম দুটো হাসান-হোসেন একসঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। একবার হাসান-হোসাইন দু'জনের প্রতি ভালবাসার মানদণ্ড নির্ধারণের বিষয়ে হজুর (দ.)'র নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বিষয়টি আল্লাহর উপর নির্ধারণের ভার দিয়ে একটি আপেল আনতে বলেন। উপস্থিত সকলকে তিনি জানান আপেলের যে অংশে হাসান এবং যে অংশে হোসাইনের নাম থাকবে সে অনুযায়ী আপেলের যে দিক বেশিরভাগ থাকবে তাঁর প্রতি ভালবাসার দাবী বেশি থাকবে। মান নির্ণয়ের জন্যে আপেলটি উপরের দিকে নিক্ষেপ করার পর দেখা গেল আপেলটি এমনভাবে বিভক্ত হয়ে দু'ভাগ হয়ে নিচে পড়েছে হজুর (দ.) হাতে নিয়ে দেখলেন বিন্দু পরিমাণ কোনদিকে বেশি ঝুকেনি-একেবারে সমান সমান। অতঃপর হজুর (দ.) ঘোষণা দেন তাঁদের দু'জনের প্রতি সমান ভালবাসা রাখা মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেছেন।

হ্যরত হাসান-হোসাইন (রা.) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানব আকৃতিতে আবির্ভূত বিশ্বনবী (দ.)'র উষ্ণ সান্নিধ্যের পরম পিতৃস্মেষে পালিত হয়েছেন। ফলে সমস্ত মানবিক গুণাবলি এবং ঐশ্বী প্রেম তাড়নায় তাঁরা ছিলেন উত্তসিত। তাঁদের পারিবারিক পরিবেশও ছিল খুবই চমৎকার, উন্নত ও সদাচরণের তীর্থকেন্দ্র। উভয় ভাতার মধ্যে প্রবল অনুরাগ ছিল লক্ষ্যণীয়। আচার-আচরণে তাঁরা ছিলেন খুবই সংযত, বিন্মু ও শালীন। হাদীস শরিফে হ্যরত হাসান (রা.)'র পাশাপাশি হ্যরত হোসাইন (রা.)'র নামও উচ্চারিত হয়েছে অনিবার্যভাবে। হ্যরত হোজাইফা (রা.) উল্লেখ করেন, “হজুর (দ.)

বলেছেন, হে হোজাইফা, এইমাত্র হ্যরত জিবরাইল (আ.) এসে সুসংবাদ দিয়ে আমাকে বলেছেন, ‘হাসান-হোসাইন’ হবেন বেহেশ্তে যুবকদের সর্দার”।

হ্যরত হাসান এবং হোসাইন (রা.)-কে সবসময় এক সঙ্গে চলাফেরা করতে দেখা যেত। বাইরেও এক সঙ্গে বের হতেন। একদিন তাঁরা দু'ভাই এক সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। অল্প বয়স্ক হবার কারণে পথের দিশা পাচ্ছিলেন না। অনেকক্ষণ পরেও গৃহে ফিরে না আসায় হ্যরত ফাতিমা (রা.) পুত্রদের জন্যে পাগল পারা হয়ে উঠেন। দ্রুত মহান পিতা রাসুলে করীম (দ.) সমীপে হাজির হয়ে কেঁদে কেঁদে পুত্রদের অনুপস্থিতির বিষয়টি জ্ঞাত করেন। সব কথা শুনে হজুর (দ.) কন্যাকে শান্তনা দিয়ে বলেন, “নিশ্চয় যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের প্রতি তোমার চাইতেও বেশি দয়ালু ও যত্নবান”।

কন্যার মনোবেদনা লক্ষ্য করে অতঃপর বিশ্বনবী (দ.) তাঁদের নিরাপত্তার জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। ইতোমধ্যে তাঁদের অবস্থানের খবর আসে। হজুর (দ.) সেখানে গিয়ে দেখেন তাঁরা দু'জন একে অন্যের বাহুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন। নবী করীম (দ.) সেখানে পৌঁছে তাঁদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দু'জনের মুখে চুমু খেয়ে জাগিয়ে তোলেন। তিনি হ্যরত হাসান (রা.)-কে ডান কাঁধে এবং হ্যরত হোসাইন (রা.)-কে বাম কাঁধে তুলে নেন। এরপর বলেন, “আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের প্রতি সেভাবেই দৃষ্টি রাখবো যেভাবে মহান সম্মানিত ও গৌরবের অধিকারী আল্লাহ তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন”। উক্ত ছান থেকে আসার পথে হ্যরত আবু বকর (রা.)'র সঙ্গে হজুর (দ.)'র সাক্ষাত ঘটে। তখন সিদ্ধিকে আকবর (রা.) বলেন: “ইয়া রাসুলুল্লাহ (দ.), একজনকে আমায় দিন যাতে আপনার বোঝা কিছু হাল্কা হয়”। কিন্তু নবী করীম (দ.) জবাব দেন, কী চমৎকার বাহন তাঁদের আর কী চমৎকার আরোহীই না তারা, আর তাঁদের পিতা (হ্যরত আলী ক.) তাঁদের চেয়ে উত্তম”। এভাবে তিনি তাঁদেরকে মসজিদে নববী পর্যন্ত বহন করে নেন। এখানে আরো একটি তাৎপর্য ব্যঙ্গময় হয়েছে যে, রাসুলে করীম (দ.) তাঁদের উভয়কে সম-মর্যাদায় সমানভাবে ভালবাসতেন বিধায় হ্যরত আবু বকর (রা.)'র যাচনা সত্ত্বেও কোন একজনকে নিজের কাঁধ থেকে অন্যত্র সমর্পণ করেননি। হ্যরত আবু বকর (রা.)'র মতো প্রধান সাহাবী এবং সওর গুহার একান্ত সঙ্গীর কাঁধে যদি তাঁদের কাউকে সমর্পণ করতেন তাহলে পরবর্তীতে এ ঘটনা নিয়ে ছিদ্রান্বেষীরা ভালবাসার তারতম্য সম্পর্কিত ফিত্নার অবতারণা করতো। বিশ্বনবী (দ.) হাসান-হোসাইন (রা.)-কে এতো অধিক স্নেহ করতেন যে, প্রায়শ কাঁধে নিয়ে

ঘোরাঘুরি করতেন। এ বিষয়ে হ্যরত উমর ফারুক (রা.) উল্লেখ করেন, “একবার আমি হজুর (দ.)'র খেদমতে হাজির হলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, তিনি হ্যরত হোসাইন (রা.)-কে নিজের পিঠে বসিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের মুখে লাগামের ন্যায় একটি রশি লাগিয়ে হ্যরত হোসাইন (রা.)'র হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন, আর নিজে হামাগুড়ি দিয়ে উটের ন্যায় চলেছেন। আমি এ দৃশ্য দেখে বললাম ‘হোসাইন, কতইনা উত্তম তোমার এই উট’। নবী করীম (দ.) বললেন, ‘হে উমর, আরোহীও কত উত্তম’।”

তারিখ বিন আসাকির বর্ণনায় এসেছে, হ্যরত আবু আইউব আনসারী (রা.) উল্লেখ করেন, একদিন আল্লাহর হাবীব (দ.)'র দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখেন হ্যরত ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসাইন (রা.) বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র বুকের ওপর খেলছেন। হ্যরত আবু আইউব আনসারী (রা.) বলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি কি তাঁদেরকে ভালবাসেন? হজুর করীম (দ.) বলেন, “আমি কীভাবে তাঁদের ভাল না বেসে পারি, যেখানে পার্থিব জীবনে তারা আমার রায়হানা (ফুল)”。 তারিখ বিন আসাকির অন্য এক বর্ণনায় হ্যরত ইয়ালা আল আমিরি (রা.)'র উদ্ধৃতির উল্লেখ আছে, একদিন তিনি রাসুল করীম (দ.)'র সঙ্গে দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন হ্যরত হোসাইন (রা.) কিছু ছেলের সঙ্গে খেলছিলেন। হজুর (দ.) তাঁকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। কিন্তু স্বভাবজাত চপল হ্যরত হোসাইন (রা.) বারবার এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকেন। রাসুলে খোদা (দ.) তাঁকে কজা না করা পর্যন্ত তিনি (হ্যরত হোসাইন রা.) ছুটোছুটিতে থাকেন। এদিকে হ্যরত হাসান (রা.)'র ছোট কোমল একটি হাত নানাজী (দ.)'র ঘাড় মোবারকের নিম্নে রাখেন। এক পর্যায়ে হ্যরত হোসাইন (রা.) কজাভুক্ত করে চুমু খেতে খেতে বলেন, “হোসাইন আমার থেকে, আমি হোসাইন থেকে। যে হোসাইনকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। সে আমার দৌহিত্রের মধ্যে একজন। যে আমাকে ভালবাসে সে যেন হোসাইনকে ভালবাসে”।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র প্রতি রাসুলে করীম (দ.)'র ভালবাসা বিষয়ে ইবনে মাজাহ হতে বর্ণিত “তিনি তাঁকে (হ্যরত হোসাইন রা.) সাথে সাথে রাখতেন। এমনকি দাওয়াতেও শরীক করতেন। তাঁর শিশুসুলভ চপলতাকে সহাস্যে সহ্য করে যেতেন। স্নেহ মমতায় তাঁকে চুমু খেতেন। তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। বলতেন, “সে সিবতুম মিনাল আসবাত” অর্থাৎ উত্তম জাতির অংশ। তিনি তাঁর জন্যে আল্লাহ রাকুন আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ জানাতেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন

হ্যরত হোসাইন (রা.)-কে ভালবাসতে”। তিরমিজী শরিফে উল্লেখ আছে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রা.) বলেন, “রাসুলুল্লাহ (দ.) হাসান-হোসাইনের জন্যে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে বলতেন, ‘আল্লাহ-পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে আমি তোমাদের পানাহ চাই, সমস্ত শয়তান, বিষাক্ত, নীচাশয় জীব ও ঈর্ষাপরায়ণ নজর হতে’।”

খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা হ্যরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হ্যরত হাসান এবং হোসাইন (রা.)-কে সর্বাধিক ভালবাসতেন এবং তাঁদের নৈকট্য কামনা করতেন। হ্যরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) রাসুলে করীম (দ.)’র পরিবারের সদস্যদেরকে সর্বাধিক ভালবাসতেন এবং মর্যাদা প্রদান করতে আহ্বান জানাতেন। হ্যরত আবু বকর (রা.) বলতেন, “হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)’র পরিবারের সদস্যদের সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে রাসুলে করীম (দ.)’র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো। তিনি বলেছেন, সেই সত্ত্বার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে আমার নিজের আত্মীয়ের চেয়ে হ্যরত রাসুলে করীম (দ.)’র আত্মীয়গণ বেশি প্রিয়।”

দ্বিতীয় খলিফা হ্যরত উমর বিন খাত্বাব (রা.) হ্যরত হাসান এবং হোসাইন (রা.)-কে সম্মানের চোখে দেখতেন এবং যথাযথ মর্যাদা দিতেন। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রেখে চলতেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রা.) বলেন, “হ্যরত উমর (রা.) ইমাম ভাতৃদেরকে এতো ভালবাসতেন যে, নিজের ছেলেমেয়েদের ওপরও তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন। বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার পর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের জন্যে পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। হ্যরত উমর ফারুক (রা.) ইমাম ভাতৃদের জন্যেও (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও) জনপ্রতি পাঁচ হাজার দিরহাম করে ভাতা প্রদান করেন। এ ধরনের বষ্টন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) জানতে চান, ‘আকবা, আপনিতো জানেন, আমি অনেক আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং হিজরতও করেছি। তবুও আপনি এই দুটো ছেলেকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দেন?’ পুত্রের কথা শুনে হ্যরত উমর (রা.) বলেন, ‘আবদুল্লাহ, তোমার কথা শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম। তুমি আমাকে বল তোমার নানা কি হাসান-হোসাইনের নানার মতো? তোমার মা কি তাঁদের মা’র মতো? তোমার নানী কি তাঁদের নানীর মতো? তোমার চাচা কি তাঁদের চাচার মতো? তোমার ফুফু কি তাঁদের ফুফুর সমান? শোন, তাঁদের নানা নবীকুল শিরোমনি রাসুলুল্লাহ (দ.). তাঁদের মা বেহেশ্তের মহিলাদের নেতৃ হ্যরত ফাতিমা (রা.)। তাদের নানী হ্যরত খাদিজা (রা.)। তাদের মামা রাসুল (দ.)’র ছেলে ইব্রাহীম (রা.). তাঁদের খালা রাসুল

(দ.)’র কন্যা হ্যরত যয়নব, হ্যরত রুকাইয়া এবং হ্যরত উম্মে কুলসুম (রা.)। তাঁদের চাচা হ্যরত জাফর (রা.) এবং ফুফু উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা.)।” উল্লেখ্য যে, বাইতুল মাল থেকে যখন ভাতা বরাদ্দ হলো, তখন হ্যরত উমর (রা.) ইমাম ভাতৃদের জন্যে হ্যরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)’র সমপরিমাণ পাঁচ হাজার দিরহাম করে বরাদ্দ করেন। অর্থাৎ বদর যোদ্ধাদের ছেলেরা ভাতা পেতেন দু’হাজার দিরহাম করে।

একবার ইয়েমেন থেকে কিছু মূল্যবান পোশাক মদিনায় আসে। খলিফা হ্যরত উমর (রা.) সেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দেন। জনগণ পোশাক পরিধান করে বাইরে এসে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু কীভাবে যেন হ্যরত হাসান-হোসাইন (রা.) ভাতৃদ্বয় পোশাক পাননি। তাঁরা যখন হ্যরত ফাতিমা (রা.)’র বাড়ী থেকে বাইরে আসেন তখন তাঁদের পরনে ইয়েমেনী পোশাক ছিল না। এ দৃশ্য দেখে হ্যরত উমর (রা.) অস্ত্র হয়ে ওঠেন। তিনি উপস্থিত অন্যান্য লোকদের জানান, “তোমাদের নতুন ইয়েমেনী পোশাক পরায় আমি খুশী নই।” কারণ জিজেস করলে তিনি বলেন, “এই দুই বালকের কারণে তোমরা সবাই নতুন পোশাক পেয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের নতুন ইয়েমেনী পোশাক নেই।”

হ্যরত উমর তৎক্ষণাত ইয়েমেনের শাসক সমীপে লিখেন, “অবিলম্বে হাসান-হোসাইনের জন্যে উৎকৃষ্টমানের দু’জোড়া পোশাক পাঠিয়ে দিন”। পোশাক আসা মাত্রই হ্যরত উমর (রা.) পোশাক দু’টো তাঁদের পরান এবং বলেন, “এখন আমি যথার্থই খুশী”। অবশ্য এ বিষয়ে একটি বিবরণ হ্যরত ইবনে কাসীর (রহ.) ‘আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া’ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “একবার ইয়েমেন থেকে কিছু চাদর আসে। হ্যরত উমর ফারুক (রা.) চাদরগুলো সাহাবী পুত্রদের মধ্যে বষ্টন করে দেন। এই চাদরগুলো থেকে তিনি হ্যরত হাসান এবং হোসাইন-কে একটিও দেননি। বরং উল্লেখ করেন, ‘চাদরগুলোর কোনটিই তাঁদের উপযুক্ত নয়’। অতঃপর তিনি ইয়েমেনের গভর্নর সমীপে দৃত পাঠিয়ে ইমাম ভাতৃদ্বয়ের জন্যে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে উপযুক্ত দু’টি উল্লতমানের চাদর আনিয়ে পরিধান করিয়ে দেন।”

তাহজিবুল কামাল গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৪০৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, হ্যরত হোসাইন (রা.) উল্লেখ করেন, “একদিন আমি হ্যরত উমর (রা.)’র কাছে গেলাম। তিনি তখন আমীর মুয়াবিয়ার সঙ্গে একাকী ছিলেন। দরজায় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)’র সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বেরিয়ে আসছিলেন। আমিও তাঁর সাথে বেরিয়ে এলাম। পরে হ্যরত উমর (রা.)’র সঙ্গে দেখা হয়। তখন তিনি বলেন, ‘বহুদিন আপনার সাথে আমার

দেখা হয় না'। আমি বললাম, 'ইয়া আমিরূপ মুম্বিনীন, আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম, আপনি আমীর মুয়াবিয়ার সঙ্গে একাকী ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সেখানে ছিলেন। তিনি ফিরে আসছিলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এসেছি'। অতঃপর হ্যরত উমর (রা.) বলেন, "ইবনে উমরের চাইতে আমার কাছে আসার হক আপনার বেশি। আমাদের মাথায় যা গজিয়েছে তা আল্লাহর অনুগ্রহ আর আপনাদের পরিবারের উসিলায়।"

আরেকটি ঘটনা। হ্যরত উমর ফারুক (রা.) তখন খিলাফতের দায়িত্বে আসীন। রাসুলে খোদা (দ.)'র দৌহিত্র হ্যরত হোসাইন (রা.) তখন কিশোর। হ্যরত উমর ফারুক (রা.) মসজিদে নববীতে খুত্বা দিচ্ছিলেন। খলিফা হিসেবে তিনি মিস্বরে বসা ছিলেন। মসজিদে নববীতে অন্যান্যদের সঙ্গে হ্যরত হোসাইন (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত স্পষ্টভাষ্য এবং সাহসী হ্যরত হোসাইন (রা.) মিস্বরে বসা হ্যরত উমর ফারুক (রা.)'র দিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, "আপনি আমার নানাজী (দ.)'র মিস্বরে কেন বসেছেন? আপনার পিতার মিস্বরে চলে যান"। হ্যরত উমর ফারুক (রা.) মিস্বর থেকে নেমে সঙ্গে পরম আদরে হ্যরত হোসাইন (রা.)-কে তুলে নিয়ে মিস্বরে নিজের পাশে বসিয়ে বলেন, "আমার পিতার কোন মিস্বর নেই। এই মিস্বর আপনার নানাজী রাসুলে খোদা (দ.)-এর। রাসুলে করীম (দ.)'র বদান্যতা এবং আপনাদের বরকতে আমি এই মিস্বরে আসীন হয়েছি। আপনি এখানে এসে দয়া করে আমাদেরকে সাহচর্য দানে বাধিত করলে খুশী হব"।

হ্যরত উসমান যুনুরাইন (রা.)'র খিলাফতকালে বিদ্রোহীরা মদিনা শরিফে আগমন করে এক পর্যায়ে খলিফার বাসগৃহ ঘেরাও করে। "বিদ্রোহীদের তৎপরতা অবহিত হয়ে হ্যরত আলী (ক.) ইমাম ভাত্তাকে খলিফা গৃহের প্রবেশদ্বারে অবস্থান গ্রহণ করে হ্যরত উসমান (রা.)'র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেন। হ্যরত উসমান (রা.) গৃহ দ্বারে ইমাম ভাত্তাকে অবস্থান গ্রহণের তথ্য অবহিত হয়ে খলিফা বিচলিত হয়ে ওঠেন। বিদ্রোহীদের ঝুঁঁ আচরণে ইমাম ভাত্তাকে অবস্থান গ্রহণ করে হ্যরত উসমান (রা.) তাঁদেরকে গৃহ দ্বারের সম্মুখ থেকে সরে যেতে অনুরোধ জানান। ইমাম ভাত্তাকে পিতৃ নির্দেশের প্রতি অনুগত থেকে গৃহ দ্বারে অবস্থান করায় বিদ্রোহীরা সম্মুখদ্বার বাদ দিয়ে পেছন দুয়ারে গিয়ে হ্যরত উসমান (রা.)'র গৃহভ্যৱহারে ঢুকে পরে খলিফাকে শহীদ করে।

'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' কিতাবের ৪৮ খণ্ডে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ঘটনা বর্ণনা করে উল্লেখ

করেন, তিনি (ইবনে আব্বাস) প্রায়শ বহনকারী পশ্চদের হ্যরত হাসান এবং হ্যরত হোসাইন (রা.)'র কাছে নিয়ে আসতেন। এ কাজ তিনি পরম সৌভাগ্যের মনে করতেন। ইমাম ভাত্তাকে যখন পবিত্র কাঁবা তাওয়াফ করতেন লোকজন তাঁদের অভিনন্দন জানানোর জন্যে ঘিরে ধরতেন। লোকজনের ভির দেখে মনে হতো গণমানুষের আবেগঘন ভিরে হ্যতো তাঁরা পিষ্ট হয়ে যাবেন।

তারিখে ইবনে আসাকীর ৪৮ খণ্ডে বর্ণিত, "হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। দারিদ্র্যের ভয়ে দান করা থেকে তিনি কখনো বিরত থাকতেন না। তাঁর দানশীলতা ছিল বাতাসের প্রবাহের মতো। একদিন এক ভিখারী মদিনা শরিফের অলি-গলি ঘুরে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে কবিতার ছন্দে বলতে শুরু করেন,

"আজকের দিনে যে কেউ আপনার কাছে হাত পাতবে

সে কখনো নিরাশ হবে না

যে আপনার দরজায় করাঘাত হানবে,

আপনি হচ্ছেন উদার হস্ত, বদান্যতার প্রতীক

আপনার মহান পিতা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে করেছেন লড়াই"।

যখন হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র দরজার সম্মুখে ভিখারীর ফরিয়াদ চলছিল তখন নবী দৌহিত্র ছিলেন ইবাদত রত। ভিখারীর হাঁক-ডাক শুনে তিনি নামায শেষ করে বাইরে আসেন। ভিখারীর চোখে মুখে দারিদ্র্যতার ছাপ ভেসে আছে। তিনি তাঁর খাদেম কাস্বারকে ডেকে পাঠান। ভিখারীর আর্জি অবহিত করে তিনি গৃহে কতটুটু সম্পদ জমা আছে তা কাস্বারের নিকট জানতে চান। কাস্বার জানালেন, নবী

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিলি করার মতো মাত্র দু'শ

দিরহাম অবশিষ্ট আছে। অতঃপর হ্যরত হোসাইন (রা.)

কাস্বারকে নবী পরিবারের জন্যে রক্ষিত সমস্ত দিরহাম নিয়ে আসতে বলেন। তিনি কাস্বারকে আরো জানান যে, নবী

পরিবারের সদস্যদের চেয়ে উপস্থিত ব্যক্তির নিকট দিরহামের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। দিরহাম ভিখারীর হস্তে তুলে দিয়ে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) বলেন, "এটা রাখুন, আমি

আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আমার অন্তর আপনার জন্যে বিগলিত। আমার যদি আরো থাকতো তাও আপনাকে দিয়ে দিতাম।

উন্মুক্ত আকাশ হতে সম্পদের বারিপাত ঝরুক, আপনার মাথার পরে, কিন্তু ভাগ্যের ওপর সন্দেহ আমাদের অসুখি করে রাখে"। দান গ্রহণ করে অতঃপর ভিখারী বেদুস্ন

কাব্যিক ছন্দে গেয়ে ওঠে:

"তাঁরা পাক পবিত্র, যেমন পবিত্র তাঁদের সম্পদ,

তাঁদের নাম যেখানেই উচ্চারিত হয়,

সেখানেই নায়িল হয় আল্লাহর অবারিত রহমত।

আর আপনি হচ্ছেন সুমহান উচ্চশির,
আপনার রয়েছে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান,
আয়াতে কী বলা আছে তা আপনি জানেন উত্তমরূপে,
আলীর পরিবার ছাড়া কারো অধিকার নেই অহংকারের”।
যে কোন উত্তম কামনায় দান করার ব্যাপারে হ্যরত হোসাইন
(রা.)’র অভিমত হচ্ছে, “সেই অর্থই সর্বোত্তম যা আরেকজন
মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে”।

উসদুল গবাহ কিতাবে উল্লেখ আছে, দানশীলতা ও পুণ্যকর্ম
সাধনে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) ছিলেন সুপরিচিত।
বহুবিধ সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত
রাখতেন। আয়-যুবায়ের বিন বাকর উল্লেখ করেন, “হ্যরত
ইমাম হোসাইন (রা.) পবিত্র মদিনা থেকে মক্কায় ২৫ বার
পদব্রজে গমন করে পবিত্র হজ্র পালন করেন। রাব্বুল
আলামীনের শাহী দরবারে তাঁর আকুতি এবং আহাজারি
প্রকাশের ধরন ছিল চরম বিন্দুতার বহিঃপ্রকাশ। প্রার্থনা শেষে
ফরিয়াদ পেশ করে তিনি বলতেন, ‘হে আল্লাহ, জীবনের
প্রতিটি দৃঢ় দুর্দশায় আমি আপনার ওপরেই নির্ভর করি।
প্রতিটি বিপদেই আমি আপনার ওপর ভরসা করি। আমি যে
অবস্থায়ই থাকিনা কেন, সর্বাবস্থায়ই আপনি হচ্ছেন নির্ভরতার
স্তুল, আমার অর্জিত সকল নিয়ামত আপনারই দান এবং
আপনিই এই সকল কল্যাণের উৎস’। প্রার্থনার ভাষায় নিজেকে
অতি নগণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে তিনি বলতেন, ‘হে আমার
প্রভু, আপনি আমাকে সংরক্ষণ করেছেন কিন্তু আমাকে কৃতজ্ঞ
পাননি। আমাকে পরীক্ষা করেছেন কিন্তু ধৈর্যশীল পাননি।
তবুও আমার অকৃতজ্ঞতার কারণে আপনি আমাকে রিজিক
থেকে বাস্তিত করেননি। আমি অধৈর্য্য হওয়া সত্ত্বেও আপনি
আমার বিপদকে স্থায়ী করেননি। শ্রেষ্ঠতম দয়ালু প্রভুর কাছ
থেকে দয়া ও করুণা ছাড়া বিপরীত কিছু নায়িল হয় না”।
প্রতিটি মুনাজাতে মহান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের
অকৃত্রিমতায় ভরপুর হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) জীবনের
সকল ভয় ও আশা মহামহিম আল্লাহর ওপরই সোপর্দ
করতেন। কার্যকারণের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন
ব্যক্তিকে তিনি স্বীকার করতেন না। আল্লাহ সকল প্রকার
কল্যাণ-অকল্যাণ সাধনের একমাত্র মালিক। ইবাদত,
একান্থতা, আনুগত্য, বিনীত সমর্পণ, আল্লাহর সাম্মিধ্য লাভের
লাগাতার প্রচেষ্টা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য হাসিল সম্ভব নয়।
ইসলামী ফিকহ সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হ্যরত
ইমাম হোসাইন (রা.) এমন এক বিরল ব্যক্তিত্ব যিনি সূরা
ফাতির এর ২৮ নং আয়াত উল্লেখ করে প্রায়ই বলতেন,
‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে
চলে’।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) ছিলেন দৃঢ়চেতা অত্যন্ত সাহসী,
অকুতোভয় সৈনিক। রাসুলে করীম (দ.)’র দু’টি অনুপম
বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন, “আমি রহমত
আকারে প্রেরিত হয়েছি এবং যুদ্ধের আকারেও”। অন্যত্র তিনি
ইরশাদ করেছেন, “আমি হষ্ট চিন্ত এবং রূদ্রমূর্তি”। অর্থাৎ
তাঁর মধ্যে ছিল করুণা এবং কাঠিন্যের সমারোহ। নবীজী
(দ.)’র দুই পরম সৌভাগ্যবান দৌহিত্রের স্বভাব, চরিত্র এবং
কর্মপ্রকৃতিতে উপর্যুক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য সুল্পষ্টভাবে প্রতিভাব
হয়েছে। তবে হ্যরত ইমাম হাসান (রা.) ছিলেন সর্বাধিক
মাত্রায় করুণাধারায় সমৃদ্ধ। অন্যদিকে হ্যরত ইমাম হোসাইন
(রা.) ছিলেন জিহাদী চেতনায় উদ্বৃদ্ধ, অত্যন্ত উদ্যমশীল,
কর্মচক্ষল এবং অসত্যের প্রতি ঘৃণায় ভরপুর সত্যের উপর
অটল থাকার ক্ষেত্রে প্রবল প্রচেষ্ট মহাপুরুষ। হ্যরত সাউদ
বিন উমর (রা.)’র বর্ণনায় দেখা যায়, একবার হ্যরত ইমাম
হোসাইন (রা.)’র সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী
চেতনা পর্যবেক্ষণ করে হ্যরত ইমাম হাসান (রা.) উল্লেখ
করেন, “আমি যদি আপনার (হোসাইন) মতো দৃঢ় মনোবলের
অধিকারী হতে পারতাম”। অন্যদিকে হ্যরত ইমাম হাসান
(রা.)’র সুষমা মণ্ডিত চারিত্রিক শৈলী পর্যবেক্ষণ করে হ্যরত
ইমাম হোসাইন (রা.) বলেন, “আমি যদি চমৎকার ভাষা
শৈলীর অধিকারী হতে পারতাম”। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে,
চরিত্রে বৈশিষ্ট্যগত স্বত্ত্বাধারা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হ্যরত
ইমাম হোসাইন (রা.) অগ্রজ হ্যরত ইমাম হাসান (রা.)’র
সিদ্ধান্তের প্রতি ছিলেন সম্মানজনকভাবে অনুগত। আমীর
মুয়াবিয়ার সঙ্গে সঞ্চি ও শর্ত সাপেক্ষে দেশ পরিচালনার ভার
অর্পণ বিষয়ে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র ভিন্নমত থাকা
সত্ত্বেও সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি অগ্রজ ইমাম
হাসান (রা.)’র সিদ্ধান্ত মেনে নেন।

‘আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ কিতাবে ইবনে কাসির হ্যরত
ইমাম হোসাইন (রা.)’র মক্কা পরিত্যাগ সম্পর্কে বর্ণনা
করেছেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) হ্যরত
ইমাম হোসাইন (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, “আপনি কোথায়
যাচ্ছেন? এমন লোকদের কাছে কি আপনি যাচ্ছেন যারা
আপনার পিতাকে হত্যা করেছে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিয়েছে
অপবাদ?” এ ধরনের অভিব্যক্তির জবাবে হ্যরত ইমাম
হোসাইন (রা.) বলেন, “পবিত্র মক্কা নগরীতে রক্তপাত হওয়ার
চেয়ে আমার মৃত্যু অধিক শ্রেয়”।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র ইরাক গমন বিষয়ে আমীর
মুয়াবিয়ার ছশিয়ারী প্রদান সম্পর্কিত চিঠির জবাবে ইবনে
কাসীরের বর্ণনায় দেখা যায়, “আপনার চিঠি আমার হস্তগত
হয়েছে। আমার সম্পর্কে আপনার কাছে যে সংবাদ পৌছেছে

আমি তার যোগ্য নই। আমি যদি আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিত্যাগ করি তাহলে আমার আশঙ্কা হয় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন না। আর আপনি ক্ষমতা দখল করে যেভাবে এ জাতির ঘাড়ের উপর চেপে বসেছেন তার চেয়ে বড় ফিত্না আর হতে পারে না”। এ ধরনের জবাবের পর আমীর মুয়াবিয়া বলেছিলেন, “আবু আবদুল্লাহ্ (হ্যরত হোসাইন রা.) সম্পর্কে আমরা যা জানি তা হচ্ছে তিনি ছিলেন সিংহের মতো সাহসী। যা সত্য বলে তিনি বিশ্বাস করতেন তা আঁকড়ে ধরতে তিনি কখনো পিছপা হতেন না, যদিও এতে তাঁর মৃত্যুরও ঝুঁকি থাকত”। সিয়ারু আলম আনু নুবালা’র তয় খণ্ডে উল্লেখ আছে আল আইজার বিন হুরায়িশ বলেন, “একদিন কাঁবা গ্রহের ছায়ায় হ্যরত আমর বিন আল আস (রা.) বিশ্বাম রত আছেন। হঠাৎ তিনি হ্যরত হোসাইন (রা.)-কে দেখে বলে উঠলেন, “বেহেশ্তবাসীদের চোখে আজকের দিনে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিচরণকারী মানুষের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন প্রিয়তম মানুষ”। নৈতিক বিবেচনায় প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বীকৃত দু’জন সাহাবার উপর্যুক্ত মন্তব্য হ্যরত হোসাইন (রা.)-এর চারিত্রিক সমৃদ্ধতাকে আরও স্পষ্ট করেছে।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) ছিলেন অত্যন্ত শিল্পীত বাগী। উপস্থিত বক্তৃতার অসাধারণ ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি শ্রেতাদের মন্ত্রমুক্ত করে রাখতে সক্ষম ছিলেন। হ্যরত উসমান (রা.)’র খিলাফতকাল। প্রথ্যাত সাহাবা সত্যের সৈনিক হ্যরত আবু যর গিফারী (রা.) খিলাফতের কতিপয় সিদ্ধান্ত বিষয়ে ছিলেন প্রতিবাদী। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে হ্যরত উসমান (রা.) হ্যরত আবু যর গিফারী (রা.)-কে বসবাসের জন্যে আমীর মুয়াবিয়ার পরিচালনাধীন সিরিয়া প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। সেখানে আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষে হ্যরত আবু যর গিফারী (রা.)-কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্যে তাঁকে মদিনা থেকে বহিকার করে নির্জন মরু প্রান্তরে অবস্থানের নির্দেশ কার্যকর করা হয়। মদিনা শরিফ পরিত্যাগকালে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) এক অনিদ্বারিত বক্তৃতায় বলেন, “হে চাচাজান, আপনি যা দেখেছেন আল্লাহ্ অবশ্যই তা পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখেন এবং প্রত্যেক দিনই লোকজন ও দুনিয়ার স্বার্থে নতুন নতুন সৃষ্টি অন্তিমের আনয়ন করে থাকেন। লোকজন দুনিয়ার স্বার্থে আপনাকে পরিত্যাগ করেছে আর আপনি তাদের পরিত্যাগ করেছেন দ্বিনের কারণে। অতএব আল্লাহ্ রাকুল আলামীনের দরবারে ধৈর্য ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রবৃত্তির তাড়না ও মানসিক উদ্বেগ থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় ভিক্ষা চান। কারণ ধৈর্য দ্বিনেরই অঙ্গ এবং মহৎ গুণ। কেবল ইচ্ছার তাড়নায় মানুষ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না এবং নির্ধারিত সময় শেষ না হলে উদ্বেগও

নিরসন হয় না”।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র কাব্য প্রতিভার অনবদ্যতার প্রকাশ পাওয়া যায় লিখিত কবিতাগুলোতে। ইসলামী দর্শনমুখ্য কবিতাসমূহে ফুটে উঠেছে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যের ছোঁয়া আল্লাহ্’র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজেকে কোরবানী প্রদানের অদম্য স্মৃতি। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন,

“যদি দুনিয়ার জীবনকে বেশি মূল্যবান মনে করা হয়,
স্মরণ রেখ আল্লাহ্’র পুরস্কার তার চেয়েও উচ্চ মর্যাদার ও
অতীব চমৎকার।

যদি দেহকে তৈরী করা হয়েছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে,
তাহলে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুই অধিক শ্রেয়।

পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকেই যদি মৃত্যুর মাধ্যমে ছেড়ে যেতে
হয়,

তাহলে সম্পদ বিলিয়ে দিলে ক্ষতিই বা কী?

দু’দিনের এ সম্পদ নিয়ে কেনই বা এত কৃপণতা”।

অন্য এক কবিতায় সৃষ্টির প্রতি নয় স্বষ্টির প্রতি নির্ভরশীল হবার আকৃতি বংকৃত হয়েছে পরম আনুগত্য এবং বিশ্বাসের অনন্যতায়। তিনি লিখেছেন,

“সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হয়ো না,

নির্ভার হয়ে নির্ভর করো স্বষ্টির ওপর

সত্যবাদী হোক কিংবা মিথ্যবাদী,

কারো হতে মিটবে না তোমার কোন প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ্’র অফুরন্ত ভাণ্ডার হতে তালাশ করো তোমার
রিজিক।

তিনি ছাড়া রিজিকের মালিক আর কেউ নয়।

যে বিশ্বাস করে মানুষই তার প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা রাখে
বুঝতে হবে পরম দয়াল দাতার প্রতি

তার বিশ্বাস অনিশ্চেষ শূন্য”।

সম্পদের প্রতি তাঁর তীব্র অনীহার প্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত
কবিতায়:

“একজন সম্পদশালী যখন আরও সম্পদের অধিকারী হয়ে
পড়ে,

তার উদ্বেগ ক্রমশ বেড়ে যায়।

সম্পদ গ্রাস করে ফেলে তার সমস্ত সত্ত্ব।

আমরা তোমাকে চিনি,

হে জীবন ফের্না সৃষ্টিকারী,

হে ধৃংস ও বিপর্যয়ের আকর!

অধীনস্থদের বোৰা যার ঘাড়ে চেপে বসে,

তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ত্যাগের মহিমাকে শিরোধার্য করা”।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র রচনা শৈলী, শিল্পীত বক্তৃতা,
ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করে আমীর

মুয়াবিয়া কুরাইশ বংশীয় একজন লোককে একবার বলেছিলেন, “মসজিদে নববীতে যখন তুমি একদল লোককে চক্রাকারে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দেখবে যে মনে হবে তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে, ধরে নেবে যে, তা হচ্ছে আবু আবদুল্লাহ্র (ইমাম হোসাইন রা.) পাঠচক্র গোষ্ঠী যার জামা হাতের কজির অর্ধেকাংশ পর্যন্ত প্রলম্বিত”।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) ছিলেন পরম সত্যবাদী এবং স্বাধীনচেতা অচিন্তনীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ইনসানে কামিল। মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) সূরা মায়দার ৪৮ নং আয়াতাংশের ভাবার্থের আলোকে বলতেন, “হে আল্লাহর বান্দাগণ, কল্যাণকর কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করো, সৎকাজে প্রবৃত্ত হও, বদান্যতার মাধ্যমে প্রশংসা অর্জন করো, এবং স্মরণ রেখো, আল-মারফের (তাওহীদ এবং সৎকর্ম) মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুনাম এবং সাফল্য”। প্রায়শ উল্লেখ করতেন, “যে দানশীল সে-ই সম্মানিত হবে, যে কৃপণ সে লাঞ্ছিত হবে। আপন প্রয়োজনের অর্থ বিলিয়ে দেয়ার মাঝেই রয়েছে মহত্ব। প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষমা করে দেয় সে-ই সবচেয়ে উত্তম। আত্মীয়তার বক্ষনকে যে অটুট রাখে সে-ই শ্রেষ্ঠ। যে অন্যকে ইহসান করে আল্লাহ তাঁকে ইহসান করেন। কারণ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন”।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র মর্যাদা সম্পর্কে আরবের খ্যাতিমান লোক কবি ফারায়দাক লোকজনের প্রশংসনের জবাবে উল্লেখ করেছিলেন,

“তিনি (হ্যরত হোসাইন রা.) এমন এক ব্যক্তি
বাতহা নামক উপত্যকাও যাঁর পদচিহ্ন চিনে।

আল্লাহর ঘর তাঁকে চিনে, হারাম শরিফ এবং তার বহির্ভূত
অঞ্চলও তাঁকে চিনে।

তিনি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বান্দার সন্তান।

তিনি পরহেজগার, পাক পবিত্র ও জ্ঞানী।

তাঁর প্রশংসনের পরিচয় তাঁকে প্রায় অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

রুক্নুল হাতিমও তাঁকে চিনে

যখন তিনি তাকে স্পর্শ করতে আসেন ও কুরায়শ সম্প্রদায়ে
তাঁকে দেখে,

তখন তাদের নেতা বলে ওঠেন,

তিনি সম্মানের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে আছেন,

লজ্জার কারণে তিনি নজর নীচু করে রাখেন,

আর তাঁর ভয়ে অন্যরাও তাঁর কাছে নত শিরে থাকেন।

তাঁর সাথে কেউ কথা বলতে সাহস করে না,

তবে যখন তিনি মুচকি হাসেন,

তাঁর হাতে থাকে একটি বেত

যা সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ

এবং যা পরহেয়গারদের হাতে থাকে
তার নাক উঁচু (উচ্চ বংশীয়)।

তাঁর বংশ রাসুলুল্লাহ (দ.)’র বংশের অংশ বিশেষ।

তাঁর বংশ মর্যাদার খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে।

কোন দানশীল তাঁর দানশীলতার কাছে পৌছাতে সক্ষম নয়।

কোন সম্প্রদায়ের লোক তাঁর পদমর্যাদায় পৌছাতে পারেনি।

যে আল্লাহকে চিনে সে তাঁর (ইমাম হোসাইনের) প্রাধান্যতাকে চিনে।

আর এ খবর থেকেই সকলে দীন অর্জন করে থাকে।

এমন কোন সমাজ আছে কি?

যাদের গর্দানে এ সত্ত্বার প্রাধান্য ও তাঁর অনুগ্রহ বর্তায় না?”

উল্লেখ্য যে, কারবালা অভিমুখে গমনের পূর্বে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.) একবার পবিত্র কাঁবা তাওয়াফ করতে যান।

প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে হাজরে আসওয়াদ চুমু খেতে গেলে লোকজন বারবার সরে সরে তাঁকে জায়গা করে দেন। এ সময় কবি ফারায়দাককে প্রবল আগ্রহ নিয়ে বিশেষ ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইলে তখন কবি উপর্যুক্ত কবিতা শুনিয়ে হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র পরিচিতি প্রদান করেন। তবে কারো কারো মতে উপর্যুক্ত মতে কবিতা হ্যরত ইমাম জয়নাল আবেদীন (রা.) সম্পর্কে লিখিত। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবহিত।

হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র শৈশব থেকে বিশুদ্ধ জীবনচার, পরম সাহসিকতা, পরহেয়গারিতা, আদর্শ এবং নৈতিকতা বিষয়ে আপোষহীনতা, ক্ষমতা, সম্পদ, যশ-খ্যাতি প্রভৃতির প্রতি নির্লোভ এবং অনীহ অবস্থান সর্বোপরি আদর্শের জন্যে জীবন কোরবানী প্রদানে সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকার অঙ্গীকার- প্রতিটি বিষয় হ্যরত ইমাম হোসাইন (রা.)’র তাসাওফ জগতের একেকটি স্তর হিসেবে পরিগণিত। এ ধরনের স্তর অতিক্রমের মধ্যদিয়ে অবশ্যে আদর্শের জন্যে বীর বেশে শাহাদত কবুল করে নিজেই বেলায়তের সর্বোচ্চ শিরোপা ধারণ করে পৃথিবীবাসীর মুক্তির দিশারী হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়ে আছেন তিনি। (চলবে)

হাদিস শরিফ

“যারা আখেরাত চায়, তাদের জন্য ইহজীবন (সুখ) নিষিদ্ধ, যারা ইহজীবনের সুখ চায়, তাদের জন্য আখেরাত নিষিদ্ধ, আর আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের জন্য উভয় সুখ কামনা নিষিদ্ধ।”

মোক্তার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাসের কবিতায়:

গাউসুল আযম হ্যরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দিব্যশক্তির প্রশংসনি আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইকবাল

মোক্তার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাসের রচিত একটি কবিতা অছিয়ে গাউসুল আযম হ্যরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (১৮৯৩-১৯৮২) সম্পাদিত “গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত” গ্রন্থের চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে “উকিল বাবুর প্রেরিত কলা রাখিয়া দুঃখ ফেরৎ” শিরোনামে উল্লেখ আছে। এই কবিতার রচয়িতা মোক্তার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাসের বিশেষ কোন পরিচিতি এখনো পাওয়া যায়নি। তবে নাম ও পদবী থেকে বুঝা যায় তিনি চট্টগ্রাম জেলা জজ কোর্টে আইন চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর রচিত গীতি ধারার কবিতাটি হলো-

ফটিকছড়ি থানা, নাম অতি সুন্দর,
মাইজভাণ্ডার গ্রাম এক, তাহার ভিতর।
শুভক্ষণে শুভ যুগে দয়া করি আল্লাহ্, সেই
দেশে জন্মাইল শাহ আহমদ উল্লাহ্
সুপণ্ডিত আরবীতে মুখস্থ কোরান, ফকির
মাওলানা বলে বিস্তর সম্মান।
বাল্যাবধি স্বধর্মেতে ছিলেন নিষ্ঠাবান,
করিতেন জগতের সতত কল্যাণ।
নিরপেক্ষ লোক তিনি প্রসিদ্ধ ফকির,
মানুষ্য কুলেতে হন সকলের পীর।
মানবের উপকার করিবার তরে, সতত
প্রস্তুত ছিলেন প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা জিলা হতে লোক আসিয়া তথায়,
ইচ্ছামত কার্যলভে তাঁহার কৃপায়।
দেশদেশান্তরে আছে বড় নাম তাঁহার,
সর্বলোকে ঘোষে যশঃ কীর্তি অনিবার।
লোকের মনের কথা জানিতেন তিনি,
নানা প্রকার গুণ ছিল অতি বড় জ্ঞানী।
ভোগ লিঙ্গা নাহি ছিল তাঁহার অন্তরে,
খেতে দিতেন অতিথিরে নানা উপচারে।
শিষ্য সাগরিত আছে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে,
কার্য্যসিদ্ধি হয় সবার তাঁর নাম নিলে।
ফটিকছড়ির নব বাবু উকিল সরকার,

জাতিজ্যেষ্ঠ ভাই হয় সম্পর্কে আমার।
কার্যোপলক্ষে আমি সেই বাসায় ছিনু,
ফকিরের গুণ দেখি আশ্র্য হইনু।
উকিল বাবুর এক গাভী প্রসবিল, বহুদুর্ঘ
গাভী হইতে পাইতে লাগিল।
ভাগ্যক্রমে সেই সময় বাসাতে তাহার,
পাকিল কাবুলি কলা অতি চমৎকার।
তাহা দেখি নব বাবু ভক্তি সহিতে, দুঃখ
কলা দিতে চাইলেন ফকির বাড়িতে।
কহিল মনের কথা কেরানী ঠাই, অদ্যকার
দুঃখ সব তথা দিতে চাই।
কেরানী শুনিয়া তাহার মনে মনে ভাবে,
তিনি সের দুঃখ দিলে ফকির নাহি খাইবে।
জনৈক বাহক দিয়া কলা দুই কান্দি, এক
সের দুঃখ দিল ভান্ড মুখ বান্দি।
ফকিরের কাছে গিয়া বাহক কহিল, উকিল
সরকার বাবু দ্রব্য পাঠাইল।
“এত দুধ নাহি খায়” ফকির কহিয়া, কলা
রাখি দুঃখ সব দিল ফিরাইয়া।
বলিলেন, ফকির এত দুঃখ নাহি খায়,
বুঝিতে না পারি তার কিবা অভিপ্রায়।
তদন্ত করিয়া জানি কেরানীর কথা, পরদিন
পাঠাইল সব দুধ তথা।
ফকির সন্তুষ্ট হইয়া রাখে সেই দুঃখ, চক্ষে
তাহার গুণ দেখি হইলাম মুঝে।

এই রচনার সময়কাল সম্পর্কে বিশেষ তথ্য আমাদের হাতে
নেই। তবে মোক্তার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস, তাঁর জাতিজ্যেষ্ঠ
ভাই ফটিকছড়ি নিবাসী নব বাবু উকিল যে হ্যরত গাউসুল
আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী
(ক.)'র (১৮২৬-১৯০৬) সমসাময়িক ছিলেন তা তার বর্ণনায়
স্পষ্ট। কারণ, উল্লেখিত কবিতায় হ্যরত গাউসুল আযম
মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র যে কারামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে
তারা উভয়ে তার প্রত্যক্ষদর্শী। অর্থাৎ এই ঘটনা ১৯০৬

সালের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। মূল ঘটনা হলো- মোক্তার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস বিশেষ কাজে তার জ্ঞাতি ভাই ফটিকছড়ি নিবাসী নব বাবু উকিল সরকারের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। নব বাবু উকিল সাহেব হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র জন্য ভক্তিভাবে তিন সের দুধ ও কাবুলি কলার দুটি কান্দি হাদিয়া পাঠাতে কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কর্মচারী মনে মনে চিন্তা করলেন হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কি তিন সের দুধ খাবেন? তাই সে এক সের দুধ ও দুই কান্দি কলা দিয়ে বাহককে পাঠাল। বাহক হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র সামনে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই তিনি বললেন, এত দুধ কি ফকির সাহেব খাবেন? এই বলে তিনি কলার কান্দি দুটি রেখে দুধগুলো ফেরত দিলেন। নব বাবু উকিল সাহেব এই ঘটনায় ব্যথিত হলেন এবং তদন্তে জানতে পারলেন যে, কর্মচারী এই কাজ করেছে। পরদিন তিনি গাভীর সমস্ত দুধ আবার হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র কাছে হাদিয়া পাঠান। এবার তিনি তা করুল করলেন। এতে সকলেই হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র কশ্ফ সম্পর্কে অবগত হলেন। মোক্তার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাসের মনেও হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মে, যার ফলশ্রুতিতে তিনি এই কবিতা রচনা করেন।

মোক্তার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাসের এই কবিতায় হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে তিনি যে সব তথ্য উপস্থাপন করেছেন তা পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেগুলো হলো-

১. হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) পবিত্র কোরআনের হাফেজ (যা অন্য কেউ উল্লেখ করেননি) ও অসীম তত্ত্ব জ্ঞানী ছিলেন।
২. তিনি সবার কাছে ‘ফকির মাওলানা’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।
৩. তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাত-পাত নির্বিশেষে সকলের উপকার করতেন।
৪. সমগ্র মানব জাতির জন্য তিনি ছিলেন পীর বা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক।
৫. সে সময়ও সারা বাংলাদেশ এবং এর আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজন নিজেদের হাজত, মকসদ হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে আগমন করতো।
৬. সর্বলোকের তথ্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাত-পাত নির্বিশেষে সকলের মুখে ছিল তাঁর যশঃ কীর্তি।
৭. কোন প্রকার লিঙ্গ তাঁর ছিলো না এবং তিনি ছিলেন

অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ।

৮. বিভিন্ন স্থানে তাঁর যোগ্য সাগরেদ বা খলিফাগণকে তিনি নিয়োগ করেছেন।

এই কবিতার ভাব ও ভাষার সাথে আমরা ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তথা হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ৫০ বছর বয়সে কবি আহমদ আলী মিয়ার রচিত “বড় তুফান কবিতা”র ভাব ও ভাষার সাথে মিলে খুঁজে পাই। কবি লিখেছেন, “মাইজভাণ্ডার, বিনাজুরী, কুতুবছড়ি, দমদমা, রায়পুর/ মৌলভী আহমদ উল্লাহ্ জগতে মশুর (মশহুর)।” (আবদুল হক চৌধুরী, প্রবন্ধ বিচ্চার: ইতিহাস ও সাহিত্য, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, পৃ.২৬০) কবি অমলেন্দু বিশ্বাসও তাঁর গানে উল্লেখ করেন, “চাড়িয়ার জ্ঞানের চান্তি কভু নিভেনা/ ও তার সাগর ঘেরা, পাহাড়বেড়া পীর সন্ধ্যাসীর আস্থান/ বদরশাহ, আমানত, বায়েজিদ বোস্তাম/ মোহচেন, গরীবউল্লাহ্ শোকর পেটান/ আহমদ উল্লাহ্ ভাণ্ডারী জান মানুষ করে দেওয়ান।” (ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯)

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই কবিতাটি ‘জীবনী ও কেরামত’ গ্রন্থে স্থান দেওয়ার কারণ হলো দুটি।

এক. এই কবিতাটি তিনি কারামত অংশে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ এখানে হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র একটি কারামত বর্ণিত হয়েছে।

দুই. এটি হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র ভক্ত-আশেকগণের বাইরে অন্য কারো লেখা একটি সম্পূর্ণ কবিতা যাতে হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রশংস্তি গীত হয়েছে। কিন্তু কবি আহমদ আলী মিয়া ও কবি অমলেন্দু বিশ্বাসের কাব্য-গানে হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র উল্লেখ রয়েছে প্রসঙ্গক্রমে।

শতাধিক বছরের প্রাচীন মোক্তার অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাসের রচিত এই কাব্যে কবি তৎকালীন হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র আকাশচূম্বী জনপ্রিয়তা ও জগতজোড়া যশ-খ্যাতির কারণে লোক সমাগমে ভরপুর মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের একটি চিত্র অংকন করেছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ও হৃদয়ঘাসী প্রাঞ্জল ভাষায়। এতে আরো পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মাইজভাণ্ডারী দর্শনের ধর্মীয় সহাবত্তান ও আন্তঃধর্মীয় সম্পৰ্কের দিকটি তখনো সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং যার ফলে সেই সময় থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাত-পাত নির্বিশেষে সকলের কাছে এই দরবার হয়ে উঠেছে একটি নিরাপদ আশ্রয় স্থল।

প্রেমিকের প্রেমাল্পদ হ্যরত বাবা ভাগুরী (ক.) মোহাম্মদ সাজীদুল হাসান চৌধুরী

‘ইসলাম’ কেবল একটি সাধারণ ধর্ম নয়, বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন বিধান। এই ‘ঘীন’ এর যাত্রা সাধারণ ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুসারে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রাসুলে আকরাম (দ.) এর ধরাধামে আগমনের ৪০ বছর পর হতে হেরা গুহায় ধ্যানের ফসল দ্বন্দ্বপ ঐশীবাণী প্রাপ্তির মাধ্যমে শুরু হয়নি। পৃথিবীতে মানুষের মাঝে এটি চলমান রয়েছে মানবাকৃতিতে হ্যরত আদম (আ.) ও হ্যরত হাওয়া (আ.) এর বংশধারা বিকাশের মাধ্যমে। কোরআনুল করিমের সূরা ফাতেহার ৫ থেকে ৭ নং আয়াতে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে এভাবে, “আমাদের সরল সঠিক পথ নির্দেশ দান করুন। তাদের পথে, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন। এবং তাদের পথে নয় যারা অভিশঙ্গ ও পথভ্রষ্ট”। এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে তিনি শ্রেণির কথা ১. সাধারণ মোমিন, যারা সঠিক পথ সন্ধানী, ২. আল্লাহর অনুগ্রহ তথা নৈকট্যপ্রাপ্ত, ৩. যারা অভিশঙ্গ ও পথভ্রষ্ট। কুরআন ও হাদিস অনুসারে মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্বদের রাসুল-নবী-অলি নামে চিহ্নিত করা হয়। সূরা বাক্সারার ১৩৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, “তোমরা বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতিও, যা আমাদের উপর নায়িল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের প্রতি নায়িল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা মুসা ও ঈসাকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার প্রতিও, যা অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এই নবীগণের মধ্যে কোনও পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই (এক আল্লাহরই) অনুগ্রাত”।

উপর্যুক্ত আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের সকলের উপর বিশ্বাস রাখা যেমন কর্তব্য তেমনই এটাও আবশ্যিকীয় দায়িত্ব যে নবীগণের মধ্যে কাউকে বিন্দুমাত্র অসম্মান করা যাবে না, পার্থক্য করা যাবে না বিশ্ববাসীদের ঈমানের মধ্যে। যেহেতু আল্লাহ পাক নবীদের ‘মাসুম’ অর্থাৎ ‘নিষ্পাপ’ ঘোষণা করেছেন, সেক্ষেত্রে আপাতঃ দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ড অসঙ্গত মনে হলেও এটা বিশ্বাস রাখতে হবে যে তাঁরা যা কিছু বলেন এবং করেন তা আল্লাহর পক্ষ হতে বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য। সোজা কথায় তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা সম্পূর্ণরূপে নিজ ইচ্ছাতে পরিচালিত করেন। তাহলে তাদের

মধ্যে আচরণগত, প্রকাশগত এবং কর্মপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য কেন লক্ষ্য করা যায়? এক বাক্যে বলতে গেলে, এই পার্থক্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাঁদের জন্য নির্ধারিত কর্মপরিধি এবং খোদায়ী ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্রগুলোর উপর। ‘খোদায়ী ইচ্ছাশক্তি’ শব্দ দুটিই হল ইসলামের নির্যাস তাসাওউফের প্রাণকেন্দ্র। ইসলামের অভ্যন্তরীণ রহস্য জানতে হলে ‘ইলমে তাসাওউফ’ বা ‘আধ্যাত্মিক জ্ঞান’ অর্জন করার কোন বিকল্প নেই। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি কিংবা পথ প্রচলিত অর্থে ‘সুফিবাদ’ নামে পরিচিত। আসমানি কিতাব মতে ইসলামের প্রথম নবী হ্যরত আদম (আ.) এর আগমনের পর হতে এবং শেষ নবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এর আগমন পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার, মতান্তরে ২ লক্ষাধিক নবী নবুয়তের দাবী নিয়ে এসেছেন। নবুয়ত এমন একপ্রকার দায়িত্ব যার মূল কাজ হল আল্লাহর বাণী ভূবহ মানুষের মাঝে প্রচার করা। একদিকে তাঁরা সাধারণ মানুষকে অভিভাবকের মতো পথপ্রদর্শন করে মানবতার কল্যাণমূলক কাজকর্ম করেন, অন্যদিকে স্বাভাবিক মানুষের মতো তাঁরা সামাজিক নিয়ম কানুনের মধ্যে সুষ্ঠু-সুন্দর নিয়মগুলো মেনে নিয়ে সাধারণ জীবন যাপন করেন। কখনও নিয়মগুলো মানবতা ও খোদায়ী বিধান বিরোধী হলে পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। কিন্তু, সাধারণ মানুষের গঢ়বাধা চিন্তাভাবনা দ্বারা সবসময় খোদা তা’আলার অসীমতা বোধগম্য হয় না। কখনও গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হলে কিংবা কোন পরিস্থিতিতে আকুল চিন্তের প্রার্থনার ফলস্বরূপ তাঁদের মাধ্যমে খোদার যে কুদরত প্রকাশিত হয়, সেগুলো মাজেজা কিংবা মোজেজা নামে পরিচিত। খোদা চিরস্তন, তাঁর কুদরতেরও কোন সীমা নেই। নবুয়ত বা রিসালাতের সমাপ্তি হলেও বেলায়তের সমাপ্তি ঘটেনি। ‘অলা’ শব্দ হতে বেলায়তের আগমন, যার অর্থ ‘নৈকট্য লাভ’। আল্লাহর সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক মোমিন তথা সকল বিশ্বাসী ব্যক্তির রয়েছে। তাঁদের লক্ষ্য থাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (দ.) কে ভালোবাসার মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন, যেটি কুরআনের নির্দেশ। এই ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গ ঠিক কতটুকু আল্লাহ এবং রাসুল (দ.) এর পছন্দনীয় পদ্ধতি অনুযায়ী হচ্ছে তাঁর উপর ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থান নির্ভর করে। এক শ্রেণির ব্যক্তিত্ব আছেন

যাঁরা জন্মগত বা মাতৃগর্ভ থেকে নির্ধারিত (মাদারজাত) অলি হয়ে আসেন, যার প্রমাণ শৈশব হতে পাওয়া যায় কিংবা একটি নির্দিষ্ট বয়সে গিয়ে তাঁদের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। আরেক শ্রেণির ব্যক্তিত্ব আছেন যারা অন্য কোন অলির সুনজরে অথবা সুপারিশে অলিতে পরিণত হন। জন্মগতভাবে বেলায়তপ্রাপ্ত অলি-আল্লাহ'কে সুফি পরিভাষায় 'বিল আসালাত' তথা মূলগত বা প্রকৃতিগত অলি বলা হয়।

প্রত্যেক নবী রাসুলগণই আল্লাহ'র অলি (নেকট্যপ্রাপ্ত বন্ধু) ছিলেন। নবীদের যুগে আল্লাহ'র অলি বিদ্যমান ছিলেন এমন অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, যাঁরা অধিকতর রহস্যপূর্ণ চরিত্র ধারণ করতেন। যেমন, হযরত মুসা (আ.) রাসুল হিসেবে মর্যাদার দিকে এগিয়ে থাকলেও আল্লাহ'র তা'আলার নির্দেশে তিনি গোপন তত্ত্বজ্ঞানী হযরত খীজির (আ.)'র সঙ্গে অধিকতর জ্ঞান চর্চার নিমিত্তে সাক্ষাত করেন। রিসালাত, নবুয়ত এবং সর্বোচ্চ বেলায়তি শক্তির শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ পাওয়া যায় খাতেমুল আম্বিয়া (দ.) এর জীবনাদর্শ। ইনসানিয়াতেরও অনুপম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন মহানবী (দ.). মানব শিশু জন্মগ্রহণের পর হতে পরকালে যাত্রা পর্যন্ত ঠিক যে যে বিশ্বাস, আচরণ, কর্মপদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন সেগুলোর সার্বিক সর্বোত্তম সমন্বিত রূপ আমরা দেখতে পাই আল্লাহ'র রাবুল ইজতের কুদরতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি 'নূরে মুহাম্মদির' দুনিয়াবি প্রকাশ রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.) এর প্রায় ৬৩ বছর ব্যাপী চাকুর জিন্দেগীর পূর্ণমাত্রায় প্রশ়ুটিত অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে। তাঁর পরবর্তীতে বেলায়তের ধারা অব্যাহত থাকে মহান সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে। বিশেষ করে রাসুলে করিম (দ.) এর সবচেয়ে নেকট্যধন্য চারজন তাঁদের আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক উচ্চাবস্থানের জন্য এমন কিছু লক্ষ পেয়েছেন যা অপর কারও ভাগ্যে জোটেনি। যেমন, হযরত আবু বকর (রা.) এর 'সিদ্দিক' বা 'বিশ্বাসী'; হযরত উমর (রা.) এর 'ফারুক' বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী; হযরত উসমান (রা.) এর উপাধি 'যুন্নুরাইন' অর্থ 'দুই নূরের অধিকারী' এবং হযরত আলী (ক.) এর অসংখ্য উপাধির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে 'মওলা' বা 'অভিভাবক' উপাধি। হযরত আলী (রা.) এবং নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) দম্পতির বংশধর দুইপুত্র ও দুইকন্যা তথা ইমাম হাসান (রা.), ইমাম হোসাইন (রা.), যয়নাব (রা.) এবং উম্মে কুলসুম (রা.) এর মাধ্যমে রাসুলে করিম (দ.) এর বংশধারা প্রবাহিত হতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। যদিও সর্বাধিক প্রচলিত মতে, পবিত্র পাঁচজন তথা পাক

পাঞ্জাতন এর সদস্য হিসেবে রাসুল (দ.), হযরত ফাতেমা (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত হাসান (রা.) এবং হযরত হুসাইন (রা.) স্বীকৃত। আবার অন্যমতে ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হুসাইন (রা.) এর বংশধারার সন্তানগণ আওলাদে রাসুল (দ.) বলে স্বীকৃত। এই আওলাদে রাসুলের ধারায় অগণিত আল্লাহ'র অলি এসেছেন। সর্বোচ্চ স্তরের বহু প্রখ্যাত আল্লাহ'র অলি আওলাদে রাসুলের বংশধারাতেই এসেছেন, আসছেন এবং আসতে থাকবেন। এক্ষেত্রে একটি বিষয় জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ'র অলি হতে হলে রক্ত, বংশ কিংবা বংশীয় ইতিহাসের চেয়ে মুন্ডাকী হওয়ার বিশেষত্ব আল্লাহ'র নিকট সর্বাধিক গুরুত্ববহু। কেউ উপরোক্তেখিত বর্ণনা মোতাবেক জন্মগত (মাদারজাত) বা পূর্বনির্ধারিত আল্লাহ'র অলি, আবার কেউ অপর কোন অলির নজরে করমে খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে নিজে অলি হয়েছেন। এর বাইরে আরও দুইপ্রকার আল্লাহ'র অলির বর্ণনা পাওয়া যায়। এক প্রকারের অলি দুনিয়াবি ও ধর্মীয় জ্ঞানার্জন এবং তদনুযায়ী আমলের চেষ্টার মাধ্যমে খোদায়ী জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ'র নেকট্য লাভ করেন, আরেক প্রকারের অলি নিজ নফ্স প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ তথা রেয়াজত-সাধনার মাধ্যমে বেলায়ত লাভ করেন। অনেকেই আছেন কেবল একটি স্তরে অবস্থান করেছেন, অনেকে আছেন একই সময়ে সকল স্তর উত্তীর্ণ হয়ে সর্বোচ্চ স্তরের আল্লাহ'র অলিতে পরিণত হয়েছেন। অছি এ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর রচিত 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে এই চারপ্রকার বেলায়ত অর্জনের প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্ত চারটি নামে নামকরণ করেছেন-

১। বিল আসালাত - পূর্বনির্ধারিত, জন্মগত বা মূলগত হয়ে বেলায়ত প্রাপ্তি।

২। বিল বেরাসত - রূহানী উত্তরাধিকার সূত্রে খেলাফত লাভ বা অন্য কোন অলির আধ্যাত্মিক সুপারিশ প্রাপ্ত হয়ে বেলায়ত লাভ।

৩। বিদ দারাসত - দুনিয়াবি ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বাতেনি জ্ঞান তথা ইলমে লদুন লাভে বেলায়ত অর্জন।

৪। বিল মালামাত - রেয়াজত বা নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ অথবা নিজের ভুলক্রটিকে বড় করে দেখে সংশোধন প্রচেষ্টার মাধ্যমে বেলায়ত অর্জন।

যুগে যুগে অসংখ্য আল্লাহ'র অলি ধরণীর বুকে আগমন করে পথহারা মানুষের দিশারী হিসেবে কাজ করেছেন, নতুন মাজহাব, পদ্ধতি এবং তুরিকা প্রদান করেছেন। বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক অনুসারী সমৃদ্ধ কয়েকটি তুরিকার মধ্যে

গাউসুল আয়ম হ্যরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (ক.) প্রবর্তিত ‘কাদেরিয়া তুরিকা’, হ্যরত শায়খ বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (ক.) প্রবর্তিত ‘নকশবন্দীয়া তুরিকা’, একই সাথে প্রবর্তক এবং পরবর্তী পুরুষের জন্য অধিক খ্যাতি অর্জন করেছে। অপরদিকে হ্যরত আবু ইসহাক শামী (ক.) এর প্রবর্তিত ‘চিশ্তীয়া তুরিকা’ তাঁর তুরিকার অষ্টম ইমাম হ্যরত খাজা মঙ্গনুদ্দিন চিশ্তী (ক.) এর মাধ্যমে এবং ‘সোহরাওয়ার্দীয়া তুরিকা’ হ্যরত আবু আল নাজিব সোহরাওয়ার্দী (ক.) প্রবর্তন করলেও তাঁর ভাতুপুত্র হ্যরত শাহব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (ক.) এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অধিক খ্যাতি অর্জন করেছে। এছাড়াও ‘কলন্দরিয়া তুরিকা’, ‘মালামিয়া তুরিকা’, ‘মাদারিয়া তুরিকা’, ‘রাজ্জাকিয়া তুরিকা’ বেশ প্রচলিত এবং জনপ্রিয় কর্যেকটি তুরিকা। হ্যরত গাউসুল আয়ম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) পূর্বে প্রবর্তিত সকল তুরিকার নির্যাস সম্বলিত ‘তুরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া’ হল বাংলার জমিনে উজ্জ্বল বিশ্ববিখ্যাত প্রথম তুরিকা, যা তাঁর সুমহান আধ্যাত্মিক অবস্থান ও অতুলনীয় খোদায়ী নির্দর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর সময়েই দেশ বিদেশে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই তুরিকায় পরবর্তী সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তিত্বগণ বিশেষ করে— হ্যরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী প্রকাশ বাবা ভাণ্ডারী (ক.), কুত্বুল ইরশাদ হ্যরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আমিনুল হক ফানায়ে ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারী (ক.), অছিয়ে গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), বিশ্বালি শাহানশাহ্ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সহ মাইজভাণ্ডারী পরিবারে অসংখ্য মহান আল্লাহর অলি এসেছেন। এই মহান অলিদের আলোতে আলোকিত হয়ে বেলায়ত প্রাণ হয়ে আল্লাহর অলি হয়েছেন আরও অগণিত ব্যক্তি, যারা ‘খোলাফায়ে মাইজভাণ্ডারী’ নামে পরিচিত। মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকায় প্রদত্ত বেলায়ত সর্বোচ্চ স্তরের খোদার মাহবুব কর্তৃক সুপারিশকৃত বিশেষ মেহেরবানিতে প্রদত্ত বলে এই বেলায়ত প্রাণ ব্যক্তিত্বদের পদস্থলনের সম্ভাবনা নেই। তাই, এই তুরিকা থেকে গাউসুল আয়ম হ্যরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর বিশেষ মহৱত ও আধ্যাত্মিক সুনজরে হ্যরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) এর মতো সুমহান আল্লাহর অলির আগমণ হয়েছে। আবার ‘খোলাফায়ে মাইজভাণ্ডারী’ দের নজরে করমে অসংখ্য পথহারা ব্যক্তি আল্লাহর অলি হয়েছেন। বাবা ভাণ্ডারী (ক.) প্রথমত, জন্মগতভাবে (মাদারজাত)

আল্লাহর অলি। দ্বিতীয়ত, হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর রূহানী খেলাফত ও আধ্যাত্মিক স্নেহধন্য সুপারিশলাভে বিল বেরাসত অলি। তৃতীয়ত, ধর্মীয় জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে অত্যধিক পড়াশোনা ও জ্ঞান আহরণ করে তিনি জ্ঞান তাপস হয়েছিলেন, যদিও হ্যরত আকদছ (ক.) এর নির্দেশে সর্বোচ্চ ডিপ্রি অর্জনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেননি। চতুর্থত, তাঁর রেয়াজত বর্ণনাতীত, পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন অরণ্যে, পর্বতে, হাড় কাঁপানো প্রচণ্ড শীতে, ত্রীপ্তের তীব্র তাপদাহে, দুর্গম প্রান্তরে, নিভৃতে নিশ্চীথে খালি পায়ে একাকী ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। এক আল্লাহর ধ্যান করেছেন দিন কে দিন, মাস কে মাস। একটানা প্রায় ২৩ বছর ব্যতিক্রম ব্যতীত একটি শব্দও মুখ্য ফুটে বলতেন না, ইশারায় কাজ সম্পাদন করতেন। মাওলানা জালালুদ্দিন রূমী (র.) এর বর্ণিত ‘ফানা’ এবং ‘বাকা’ সম্পর্ণভাবে হাসিল করে তিনি কামালিয়াতের (কর্ম যোগ্যতার) সর্বোচ্চ স্তর কুত্বুল আকতাবে অবস্থান করেছেন। খিজরী মকাম তথা রহস্যপূর্ণ অবস্থানের অলি আল্লাহ্ ছিলেন বিধায় অন্তর্দৃষ্টি ও খোদায়ী রাজ রহস্যের ধারণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত তাঁর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা অসম্ভব ছিল। ধরাধামে তশরিফ আনয়নের পর হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবা’র নিকট নেয়া হলে হ্যরত কেবলা (ক.) কালাম করেন, “এই শিশু আমার বাগানের গোলাপ ফুল। হ্যরত ইউসুফের (আ.) রূপলাবণ্য তাঁহার মধ্যে আসিয়াছে।” শিক্ষাজীবনের শুরুতে তিনি ছানীয় ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এরপর একে একে চট্টগ্রাম শহরস্থ সরকারি মোহসেনিয়া মাদ্রাসা, সরকারি সিনিয়র মাদ্রাসা, ফটিকছড়ির বিবিরহাট্ট সিনিয়র মাদ্রাসা, পুনরায় চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কিন্তু, গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এর আধ্যাত্মিক নিষেধাজ্ঞায় তিনি জামায়াতে উল্লার ফাইনাল পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখে পরীক্ষার তৃতীয় দিনে বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হন। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের ইতি হল, কিন্তু ‘সিরাতুল মোস্তাকিম’ এর অনন্ত পথে তাঁর এতদূর অঞ্চলাত্মক সবেমাত্র শুরু হল। শৈশব হতে যেই মহান গাউসুল আয়মের সান্নিধ্য তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল, জোরপূর্বক যার নিকট হতে ছাড়িয়ে আনতে হতো, তিনি সেই গাউসুল আয়ম হ্যরত কেবলা কাবা (ক.)’র সোহবতে এবং খেদমতে সর্বক্ষণ লেগে রইলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি ২৩ বছর বয়সে ১৩০৭ হিজরী সনের ২৭ ফাল্গুন সৈয়দা জেরুনেসা বেগম (র.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে

আবদ্ধ হন। এই দম্পতির ঘরে চার পুত্র এবং দুই কন্যার জন্ম হয়।

আপন পিতৃব্য (জেঠা) হয়রত কেবলা কাবা (ক.) এর প্রবর্তিত তুরিকার ধ্যান জগত, সেমা সঙ্গীত ও হাল জজবাকে অত্যন্ত আপন করে নিয়েছেন। এই তিনটি বিষয় তাঁর নিয়ে কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাল জজবার সময় তিনি খোদার প্রেমে এতই বিভোর থাকতেন যে পার্থিব কোন বিষয় বিন্দুমাত্র নজরে আসত না। হাল জজবাপূর্ণ অবস্থায় জনাব আব্দুল মজিদ মিয়া বাবা ভাঙারী কর্তৃক প্রহারিত হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে হয়রত (ক.) তাঁর জজবার রহস্য উন্মোচন করে কালাম করেছেন, ‘উহ সাহেবে জালাল হ্যায়, মূলকে এয়ামন মে রাহাতা হ্যায়। আলমে আরওয়াহ মে সায়ের করতা হ্যায়। আপতো হামারে ছাত রহিয়েগা। উনকে পাছ কিউ গেয়া?’ [জীবনী ও কেরামত, পরিশিষ্টাংশ] তিনি মাঝেমধ্যে সেমার ইমামতি করতেন, অনেক সময় তাঁর সামনে তাঁর শানেই সেমা হতো, আবার অনেক সময় তিনি কেবল নিরবে শ্রবণ করতেন। তাসাওউফের শিক্ষা হচ্ছে স্বীয় পীরের অভ্যন্তরে আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ এবং রাসূলের আদর্শ বিরাজ করছে এমনটি বিশ্বাস রাখা। মুরিদরা এই বিশ্বাসের কারণেই পীর বা মুশিদ কেন্দ্রিক যাবতীয় চিন্তাভাবনা ও প্রাণজগতে বিচরণ করে থাকেন। তাই বাবা ভাঙারী (ক.) কারও নিকট কেবল একজন আল্লাহর অলি, আবার কারও নিকট স্বয়ং মহাপ্রভুর রাজ রহস্য উন্মোচনের দুয়ার। কারও নিকট আল্লাহর নেকট্যপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তিত্ব; কারও নিকট আল্লাহর কৃপা পাওয়ার আশ্রয়স্থল। ভক্তগণ তাঁকে ‘রহমান মওলা’, ‘বাবাজান কেবলা’, ‘বড় মাওলানা’, ‘বাবা ভাঙারী’ প্রভৃতি নামে স্মরণ করেন। আর সমকালীন অলি-বুজুর্গগণ এর নিকট তিনি এমন একজন আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি চাওয়া মাত্র একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও সর্বোচ্চ স্তরের আল্লাহর অলিতে পরিণত করতে পারতেন। গাউসুল আযম হয়রত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাঙারী (ক.) এর দ্বারা প্রস্ফুটিত অনন্য সৌরভ্যমণ্ডিত ফুল গুলে গোলাব ছিলেন তিনি। তাঁর কারামত সাধারণের বর্ণনার বাইরে কল্পনাতীত। তাঁকে একনজর দেখলে প্রেমিকের প্রাণ জুড়িয়ে যায়, তাঁর একটুকু আধ্যাত্মিক সুগন্ধি ধারণ করতে পারলে অর্থাৎ এক মুহূর্তের দয়ার নজরে চরম পাপী পরম সুফি হয়ে যায়। তাঁরই একজন ভক্ত ফকির রমেশ শীল মাইজভাঙারীর লেখা,

‘এক নজরে হেরে যাবে, দিলের পর্দা যায় তার ছিঁড়ে,
এলমে লদুন জারি করে চোখের ইশারায়।’

যুগ যুগ ধরে গাউসুল আযম মাইজভাঙারী (ক.) এর বেলায়ত বাগানের অতুলনীয় অবস্থানে থেকে ভক্তদের হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাই নিয়ে ‘মওলায়ে রহমান’ কিংবা ‘বাবাজান কেবলা’ নামে তিনি চিরভাস্তর হয়ে আছেন। তাঁকে নিয়ে লেখা হতে থাকবে পৃষ্ঠার পর পর পৃষ্ঠা, চলছে গবেষণা, রচিত হবে অজস্র কবিতা-গান, তাঁর অলৌকিক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা চলতে থাকবে অনন্তকাল। প্রেমাঙ্গদের প্রতি ভালোবাসার যে উদাহরণ তিনি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে গিয়েছেন, বিদ্যম্ভ প্রেমিকের হৃদয়ের নিভু নিভু সলতের মধ্যে বিশুদ্ধ ঐশ্বী প্রেমের যে আগুন তিনি জুলিয়ে দিয়েছেন তা প্রজ্বলিত হয়ে ছড়াতে থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। মন্তীহালে তাঁর চেরাগের আলোতে ঝাঁপিয়ে পতিত হয়ে ভঞ্চীভূত হয়েছেন অসংখ্য খোদা প্রেমিক। উর্দ্ধ কবি মির্জা মুহাম্মদ রফির ভাষায়, “পরওয়ানা আওর শামা কি উলফাতে না মুখ সে পুছো। আপনি না কেহ সাকা তো কেয়া পরায়ি বাতা॥ অর্থাৎ, পতঙ্গ ও প্রদীপের প্রেম, আমি আর কী বলবো। নিজেরই না বলতে পারলাম তো কী বলবো অন্যের কথা। এ ধরনের প্রেমিকের কষ্টে গীত হয়েছে “ম্যায় হ মন্তে খেয়ালে ভাঙারী”। প্রেমিকের এ স্তরের উন্নত নিবেদনে তিনি নিজেই হয়ে পড়েছিলেন প্রেমিকদের প্রেমাঙ্গদ। তাঁর প্রতি উর্ক প্রেমানুগত্যের এই ধারা চলতেই থাকবে, শেষ হবে না কখনও। এই অভিযাত্রার কোন পরিসমাপ্তি নেই।

আল-হাদিস

“অসৎ সংসর্গে সময় কাটানোর চেয়ে একা থাকা ভালো এবং একা থাকার চেয়ে সৎ সংসর্গে বসা ভালো। নীরব থাকার চেয়ে জ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলা ভালো, আর মন্দ কথা বলার চেয়ে নীরব থাকা ভালো।”

“অধিক বাকসংযম ও শিষ্টাচার, এই দুইয়ের চেয়ে ভালো কাজ আর কিছুই নেই।”

মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; হ্যরত আদম-হাওয়ার বংশধর (আলোকধারা প্রতিবেদন)

মহান আল্লাহর অগণিত সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দৈহিক কাঠামো, সৌন্দর্য, বিবেক-বোধ, বুদ্ধির সমন্বয়ে সৃষ্টি হচ্ছে ‘মানুষ’। মানব জাতির আদি পিতা-মাতা হচ্ছেন হ্যরত আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.)। পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল ধর্মগুলি উপর্যুক্ত সুনির্দিষ্ট সত্য তথ্যের ভিত্তিতে মানব জাতির ক্রমাংবিকাশধারা উপস্থাপন করেছে। আরবী ভাষায় যাকে ‘আদম’ এবং ‘হাওয়া’ সম্বোধন করা হয় ইংরেজি ভাষায় তা ‘অ্যাডাম’ এবং ‘ইভেন্স’ নামে উল্লিখিত আছে। মানব সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে কোন ধর্মগুলিতে মতভিন্নতা নেই।

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন, “স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশ্তাগণকে বললেন, ‘আমি গন্ধযুক্ত কাদার শুকনো টনটনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছি; যখন আমি তাকে সুস্থাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তাঁর প্রতি সিজদায় অবনত হবে; তখন ফেরেশ্তাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করল; ইবলিশ ব্যতীত, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অঙ্গীকার করল’”- (সূরা হিজর: ২৮-৩১)। মানব আকৃতি গঠন বিষয়ে পবিত্র কোরআনে আরো উল্লেখ আছে, “তিনি কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর তিনি তার বংশধারা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন তুচ্ছ তরল নির্যাস থেকে”- (সূরা সেজদা: ৭-৮)। “সত্য অঙ্গীকারকারীদের জিজ্ঞেস করো, ওদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না (মহাবিশ্বে) আমি অন্য যা যা সৃষ্টি করেছি? ওদের তো আমি স্বেক কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছি”- (সূরা সাফ্ফাত: ১১)। “তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির মতো শুকনো মাটি দিয়ে”- (সূরা আর রহমান: ১৪)।

পবিত্র কোরআনে মানব সৃষ্টির আনুপার্বিক বর্ণনায় মানব জন্ম প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ আছে, “তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তার থেকে তিনি তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে পুরুষটি নারীর প্রতি মমতার আকর্ষণ অনুভব করে, তার কাছে শান্তি পায়। এবং যখন সে তার স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গনাবন্ধ হয় তখন তার মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয় (প্রথম দিকে) যা ছিল হালকা বোঝা। সে অবস্থায় সে কিছু সময় পার করে। ক্রমান্বয়ে যখন গর্ভভারী হতে শুরু করে তখন তারা উভয়েই তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ!

তুমি যদি আমাদের আলোকিত সন্তান দান করো, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগোজার হবো”- (সূরা আরাফ: ১৮৯)। “হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সেই ব্যক্তি থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে অসংখ্য নর-নারী জমিনে ছড়িয়ে দিয়েছেন”- (সূরা নিসা: আয়াতাংশ-১)। মাতৃগর্ভে সন্তানের আকৃতি ধারণ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, “অতঃপর তিনি তার (আদমের) বংশধারা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন তুচ্ছ তরল নির্যাস থেকে। তারপর তাকে (মায়ের গর্ভে) সুষম করেছেন। তাঁর (আল্লাহর) কাছ থেকে রুহ (প্রাণ) সঞ্চার করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ। তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো”- (সূরা সিজদা: ৮-৯)। “আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর নিষিক্ত ডিম্ব থেকে তারপর (বিকাশমান) জ্ঞ-পূর্ণ বা অপূর্ণ মাংসপিণি থেকে। তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্য সুল্পষ্ট করার নিমিত্তে (এই বর্ণনা)। আমি যে শুক্রাণুকেই ইচ্ছা করি, নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জরাযুতে ছিতিশীল রাখি। এরপর শিশুরপে ভূমিষ্ঠ করি। তারপর কালক্রমে পরিণত বয়সে উপনীত করি। যৌবন আসার আগেই কারো কারো মৃত্যু হয়, আবার কাউকে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়”- (সূরা হজ: আয়াতাংশ-০৫)। মানুষের শারীরিক গঠন সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত আছে, “অবশ্যই আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি”- (সূরা তীব্র: ৪)। মানুষ সৃষ্টি এবং মানবজাতির বিকাশ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনার পাশাপাশি একই রকমের বর্ণনা অন্যান্য ঐশ্বী গ্রন্থসমূহের মধ্যেও পাওয়া যায়। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের গ্রন্থ ‘বাইবেল’র পুরাতন নিয়মে (যা ওল্ড টেস্টামেন্ট নামে পরিচিত) ‘সৃষ্টির প্রথম মানুষ’ সম্পর্কিত বর্ণনায় আল্লাহ প্রথম মানব-মানবীকে সৃষ্টি করেছেন বলে উল্লেখ আছে। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ওল্ড টেস্টামেন্ট ইহুদীদের ‘তাওরাত’ হিসেবে পরিচিত। হিন্দু ধর্মের বেদ, উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগুলিতে মানুষসহ সকল সৃষ্টিরজি মহান বিধাতার সৃষ্টি বলে উল্লেখ আছে। এক কথায় সকল ধর্মগুলিতে মানবসহ সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা সৃষ্টিকর্তা, মহান

আল্লাহ- এ বিষয়ে কোন প্রকার দ্বিমত নেই। মানব সৃষ্টির উপর্যুক্ত বর্ণনা সকল ধর্মগ্রন্থে স্বীকৃত সত্য। এতে মহান আল্লাহ আদমকে ‘স্বহস্তে’ সৃষ্টি করেছেন বলে উল্লেখ আছে। মানব সৃষ্টির অনবদ্য বর্ণনার পাশাপাশি আল্লাহ ফেরেশ্তাদের অবহিত করেন, “আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি”- (সূরা বাকারা: আয়াতাংশ-৩০)। এর মাধ্যমে মানব মর্যাদাও ঘোষণা করে দেন। অতঃপর পবিত্র কোরআনে মানব জাতিকে সম্মোধন করে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন: “হে মানুষ, আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। তোমাদের অনেককে (চরিত্র, জ্ঞান, শক্তি, ক্ষমতা, অর্থবিত্ত বা মর্যাদা দ্বারা) অনেকের ওপর উচ্চাসনে আসীন করেছেন। তোমাদের যাকে যা দিয়েছেন, সে আলোকেই তিনি তোমাদের পরীক্ষা নেবেন। তোমার প্রতিপালক যেমন কঠিন শান্তি দেন তেমনি তিনি ক্ষমা ও করণার আকর”- (সূরা আনআম: ১৬৫)। মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতি সম্পর্কে উপর্যুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে মানুষের দায়বদ্ধতা, অঙ্গীকার পালন এবং জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সতর্ক জীবনাচারের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পবিত্র কোরআনের অনেক সূরায় মানব জাতিকে আল্লাহ স্বয়ং ‘হে আদম সন্তান’ সম্মোধন করে মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টিজাত পরিচিতি স্পষ্ট রেখেছেন। আল্লাহ মানুষকে সম্মোধন করেছেন, ‘হে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ’ ‘হে বিশ্বাসীগণ’ ‘হে মানুষ’ প্রভৃতি অর্থপূর্ণ সুন্দর শব্দের আকর মিশিয়ে। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি ‘মানুষ’ যখন সীমালজ্বন করে তখন সুস্পষ্টভাবে তাদের যত্নগাদায়ক শান্তির ঘোষণার পাশাপাশি অপমানজনক পরিচিতিও দেয়া হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে।

পবিত্র কোরআনে মানব আকৃতি পরিবর্তনের ঐতিহাসিক নির্দেশনা বর্ণনা করে ঘোষণা করা হয়েছে, “এরপরেও তোমরা (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলে। তোমাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা অবশ্যই ধৰ্ম হয়ে যেতে। তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালজ্বন করেছিলে তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাদেরকে বলেছিলাম ধিকৃত বানর হয়ে যাও। আমি এই ঘটনা তাদের সমসাময়িক এবং পরবর্তীদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে দৃষ্টান্ত এবং মুক্তাকীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ করেছি”- (সূরা বাকারা: ৬৪-৬৬)। কর্মদোষে পৃথিবীর বুকে মানব আকৃতি পরিবর্তন প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আরো উল্লেখ আছে, “হে নবী, সমুদ্র তীরবর্তী সেই জনপদের কথা

ওদেরেকে জিজ্ঞেস করুন, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালজ্বন করত। শনিবার তাদের কাছে পানির ওপরে মাছ ভেসে আসত, অন্যদিন আসত না। এভাবেই আমি সত্যত্যাগীদের পরীক্ষা করেছিলাম। তাদের কিছু লোককে (যারা শনিবারে মাছ না ধরার অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের মাছ ধরা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করত) অন্যেরা জিজ্ঞেস করত, ‘আল্লাহ যাদের কঠিন শান্তি দেবেন বা ধৰ্ম করবেন, তাদেরকে তোমরা কেন অনর্থক উপদেশ দিচ্ছ?’ জবাবে সত্য-অনুসারীরা বলেছিল, আমরা উপদেশ দিচ্ছি, মহান রবের কাছ থেকে দায়মুক্তির জন্যে আর সীমা লজ্জনকারীরাও হয়তো আল্লাহ-সচেতন হতে পারে। এরপর পাপীরা যখন তাদেরকে দেয়া সব উপদেশ ভুলে গেল, তখনো যারা অন্যায় থেকে ওদেরকে বিরত রাখতে সচেষ্ট ছিল, তাদের আমি উদ্ধার করি। আর সত্য ত্যাগ করার জন্যে জালেমদের কঠিন শান্তি প্রদান করি। তারপরেও যারা দণ্ডের সাথে নিষিদ্ধ কাজ করে বেড়াতে লাগল, তাদের বললাম, ‘ঘূনিত বানর হয়ে যাও’- (সূরা আরাফ: ১৬৩-১৬৬)। উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে মানুষ বানরে পরিণত হবার প্রসঙ্গ হলো মহান স্বষ্টি আল্লাহর শান্তি বিষয়ক সিদ্ধান্ত। মূলত আল্লাহ মানুষ ব্যতীত অন্য সকল জীব, জন্ম, পাখিসহ জলজ উদ্ভিজ প্রাণির ভিতর ‘রুহে নাবাতী’ এবং ‘রুহে হাইওয়ানী’ প্রদান করে সৃষ্টি করেছেন। মানব রুহের নাম হচ্ছে ‘রুহে ইনসানী’ এবং যাত রুহ হচ্ছে ‘রুহুল কুদসী’। মানুষ যখন ‘ইনসানী রুহ’ হারিয়ে ফেলে ‘রুহে হাইওয়ানী’ ভুক্ত হয়ে পড়ে তখন সীমালজ্বনকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পাশবিকতা প্রদর্শন করে। তখন এ সকল মানুষ দুনিয়ার বুকে পশু হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের জন্যে উপদেশ স্বরূপ দৃশ্যমান হয়ে থাকে।

বানর থেকে মানুষ নয়, বরং কৃতকর্ম এবং সীমালজ্বনের কারণে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃক বনি ইসরাইলের কিছু মানুষকে বানরে রূপান্তরিত করার দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে। ‘কাসাসুল অম্বিয়া’ গ্রন্থে বনি ইসরাইলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁয়ালা মানবজাতিকে হেদায়তের পথ প্রদর্শনের জন্যে বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসুল-পয়গম্বরদের প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসুলদের প্রধান কাজ- সুরুচিবোধ শিক্ষা দেয়া, শর্তা, প্রবন্ধনা, প্রতারণা এবং অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশনা মানবজাতিকে অবহিত করা। নবুয়তের বাতিঘর হ্যরত ইব্রাহীম (আ.) মানবজাতির জন্যে সঞ্চাহের একটি দিন

ইবাদতের লক্ষ্যে নির্ধারণ করেছিলেন। নির্ধারিত দিন ছিল শুক্রবার। হ্যারত মুসা (আ.) পর্যন্ত শুক্রবারই ছিল ইবাদতের নির্ধারিত দিন। কিন্তু বনি ইসরাইলীদের পীড়াপিড়ীতে হ্যারত মুসা (আ.) আল্লাহর অনুমতি গ্রহণ করে শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবারকে ইহুদী সম্প্রদায়ের জন্যে ইবাদতের দিন ঘোষণা দেন। এ সময় ইবাদতের দিন শনিবারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আল্লাহ বনি ইসরাইলীদেরকে পৃথিবীত সংরক্ষণের স্বার্থে ইহজাগতিক সকল কাজকর্ম বন্ধ রাখার ঘোষণাও জারী করেন। বনি ইসরাইলীরা হ্যারত দাউদ (আ.) পর্যন্ত শনিবারের বিশেষ দিনের মর্যাদা অঙ্গুলি রাখতে তৎপর থাকে। উল্লেখ্য যে, ইসরাইলী পয়গম্বর হ্যারত ইউশা বিন নূন (আ.)'র ওফাতের পর ইসরাইলী সম্প্রদায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। এ সম্প্রদায়ের কিছু লোক লোহিত সাগরের কূলে অবস্থিত মাদ্হায়ান এলাকায় বসবাস শুরু করে। সাগর তীরে বসবাসের কারণে মৎস্য আহরণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করাকে তাদের পেশায় পরিণত করে। পেশার প্রতি স্বভাবজাত কারণে তাদের আগ্রহ এবং আসক্তি ছিল প্রবল। শনিবার তাদের ইবাদতের দিন। আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী শনিবার ব্যতীত লোহিত সাগরের কূলে বসবাসের ইসরাইলীরা বাকী ছয়দিন মাছ শিকারে ব্যস্ত দিন অতিবাহিত করত। এভাবে মৎস্য আহরণের দিন-ক্ষণ নির্ধারিত থাকায় মাছগুলো শিকারীদের হাত থেকে রেহাই পাবার লক্ষ্যে শনিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন গভীর সমুদ্রে বিচরণ করত। প্রতি শনিবার মৎস্যগুলোর বেশির ভাগই সমুদ্রের উপরিভাগে এসে পড়ত। এটি ছিল মৎস্যের প্রতি মহান আল্লাহর কুদরতি আচরণ। মৎস্য শিকার এবং মৎস্য বিচরণের প্রতি আচরণের মাধ্যমে আল্লাহ বনি ইসরাইলীদের সততা এবং ন্যায়ের বিষয়ে পরীক্ষায় নিপত্তি করেন। পবিত্র কোরআনে সূরা আরাফের ১৬৩-১৬৪ নং আয়াতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

বনি ইসরাইলীদের অনেকে হ্যারত মুসা (আ.)'র সময়কাল থেকে অঙ্গীকার মতো শনিবারে ইবাদতে লিপ্ত থাকত। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা মাছ শিকার না করলেও আহরণের লোভে গর্ত খুঁড়ে শনিবারে লোহিত সাগরের উপরিভাগে বিরচণের মাছ শুক্রবার আটকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। এতে তারা মনে করত শনিবারে সরাসরি মাছ শিকার না করে দিবসের পবিত্রতা এবং আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার যেমন রক্ষা করা হল, তেমনি পরবর্তী দিবস রবিবারে মৎস্যসমূহ আহরণ করে নিজেদের উপার্জন এবং জীবিকার উপায়েও বৃদ্ধি করা গেল।

এটি ছিল মূলত ছলচাতুরী এবং আল্লাহর নির্দেশের প্রতি শর্তাব্দী প্রদর্শন। বনি ইসরাইলী কিছু লোকের এ ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে অনেকে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে সাগর তীরে বসবাসের বনি ইসরাইলীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে মাছ ধরতেন না। এরা বনি ইসরাইলের অন্যান্য সমস্যাদেরকে মাছ ধরার ছলচাতুরী বাদ দিয়ে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অনুসরণে আহ্বান জানাতেন। আরেক দল মাছ শিকার করতনা ঠিকই, কিন্তু যারা মাছ শিকার করত তাদেরকে বিরত রাখার কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালাত না বরং বলত এদেরকে উপদেশ দিয়ে কোন লাভ নেই, ধৰ্মসই এদের ভাগ্যলিপি। এদের উপদেশ নসীহত করে কষ্ট বরণ করার প্রয়োজন নেই। তিনভাগে বিভক্ত বনি ইসরাইলীদের মধ্যে যারা উপদেশ দিতেন তাঁদের বক্তব্য হলো, আল্লাহর দরবারে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সৎকর্ম সাধনে নিজেদের তৎপরতা এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রদর্শন করা। উল্লেখ্য যে, বনি ইসরাইলীদের সৎ লোকদের উপদেশ, পথ ভঙ্গদেরকে অপকর্ম এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। লোভী, কপট, ছলচাতুরী, প্রবন্ধনার আশ্রয় গ্রহণকারী বনি ইসরাইলীদের প্রতি অতঃপর অবাধ্যতা এবং সীমালঞ্চনের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে, 'তোমরা স্থুনিত বানর হয়ে যাও'। মানুষ থেকে বানরে পরিণত হবার বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ। এর অর্থ সকল মানুষ বানর হওয়া বুঝায় না। বরং সীমা লঞ্চনকারীদের জন্যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি। অবশ্য কিছুদিন পর বানরে রূপান্তরিত হওয়া মানুষগুলো ধৰ্ম হয়ে যায়। তাফসিরে কুরতুবিতে বর্ণিত আছে, একদিন তারা অবাধ্যদের এলাকায় সুনসান নীরবতা লক্ষ্য করেন। অতপর সেখানে গিয়ে দেখেন সবাই বানর ও শুকরে পরিণত হয়ে গেছে। কাতাদাহ (রহ.) বলেন, বৃদ্ধরা শুকর এবং যুবকরা বানরে পরিণত হয়েছিল। রূপান্তরিত বানরেরা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনতে পেরেছিল এবং তাদের কাছে গিয়ে অবোর নয়নে অশ্রু বিসর্জন করেছিল, কথাবার্তাও বলেছিল। অবশ্য আল্লাহর সৃষ্টি জন্ম হিসেবে বানরের সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি নির্দেশের অন্তর্গত বিষয়; অন্যদিকে শাস্তি হিসেবে মানুষ থেকে বানরে রূপান্তর হচ্ছে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

মাহ্বুবে ইলাহী হ্যরত নিয়ামুদ্দিন আউলিয়া'র খৃত্বা সংকলন:

গ্রন্থনা: হ্যরত আমীর উলা সাঙ্গরী (রহ.)

অনুবাদ: কফিল উদ্দিন আহমদ চিশ্তী

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

৬ষ্ঠ মজলিস

শুক্রবার ৫ই শওয়াল ৭০৭ হিজরী। কদম্ববুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। ত্যাগ ও তিতিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিলো। এ সম্বন্ধে তিনি প্রচণ্ড আত্মবুদ্ধরত এক ত্যাগী দরবেশের ঘটনা বর্ণনা করলেন। দরবেশ বেশীর ভাগ সময় অনাহারে থাকায় তার পেট পিঠের সঙ্গে লেগে গিয়েছিলো। তাকে দেখলে মনে হতো এক কংকালবৎ অবয়বের মধ্য হতে নূর (ঐশ্বী আলোক) ঠিকরে বেরচ্ছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় একদিন তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধু টিপুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁকে কিছু অর্থ প্রদান করতে চাইলে তিনি বললেন, “হে খাজা আজ আমি ভরপেট কাঠাল খেয়েছি। আজকের রূজীর জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা অর্জিত হয়েছে। অতএব মাফ করুন। আজ আর আমার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর এ দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে আমার বন্ধু দেখতে পেলেন তাঁর মনের দৃঢ়তা, ধৈর্য, শক্তিমত্তা ও স্থিরতা এবং আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি তাওয়াক্কুলের উচ্চতা। এরপর হ্যরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়ের অন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। এক বুজুর্গ ছিলেন তাঁর নাম ছিলো শায়খ আলী। একদিন তিনি পা লম্বা করে বসে তাঁর নিজের খিরকা (জামা) সিলাই করছিলেন। এমন সময় সে শহরের খলিফা তাঁর নিকট আগমন করলো। তার সাথে ছিলো তার এক অনুচর। তাদের আগমনে বুজুর্গের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সূষ্টি হলো না। তিনি যেভাবে ছিলেন সে ভাবেই বসে রইলেন। খলিফার সঙ্গের লোকটি তাঁকে খলিফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ জানালো। কিন্তু তার কথায় তিনি কর্ণপাতও করলেন না। তিনি তাঁর কর্ম করে যেতে লাগলেন। খলিফার সঙ্গের লোকটি তাঁকে শেষবারের মতো পা গুটিয়ে বসতে বললো। কিন্তু এর পরও তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলোনা। অবশেষে খলিফা রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বুজুর্গ তাঁর দুই হাত প্রসারিত করে দু'জনের হাত ধরে বললেন; আমি আমার হাত উত্তোলন করেছি কিন্তু পা প্রসারিত করেই রেখেছি অর্থাৎ বর্তমানে আপনার নিকট হতে কিছু চাওয়া পাওয়ার বাসনা রাখিনা এবং ভবিষ্যতেও আপনার

নিকট আমার কোন প্রয়োজন হবে না। অতএব পা যেমন আছে তেমনই থাক।

পরবর্তী আলোচনা হলো সলুক (আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের শিক্ষা) সম্বন্ধে। তিনি বললেন, এক ব্যক্তি হ্যরত খাজা আফল শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি খেদমতে হায়ির হয়ে মুরীদ হওয়ার পর কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে নামায, রোয়া ও অন্যান্য ফরয বিষয়ের উপর উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন যে জিনিষ নিজের জন্য পছন্দ নয় তা অপরের জন্য পছন্দ করোনা। নিজের পছন্দের জিনিষ অপরের জন্য পছন্দ করবে। মুরীদ এ সব উপদেশ গ্রহণ করে চলে গেলো। বহুদিন পর সে শায়খের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললো যে, আমি আপনার মুরীদ হয়েছি অনেক দিন হলো। কিন্তু নামায, রোয়া ও অজিফা সম্বন্ধে কোন উপদেশ পাইনি। শায়খ জিজ্ঞেস করলেন, যে দিন তুমি মুরীদ হয়েছিলে সেদিন তোমাকে কি উপদেশ দেয়া হয়েছিলো? এ প্রশ্ন শুনে লোকটি চুপ হয়ে গেলো। কোন উত্তর দিলো না। হ্যরত খাজা আল শিরাজী রহমতুল্লাহি আলাইহি একটু মুচকি হেসে বললেন, সেদিন আমি তোমাকে বলেছিলাম, যে জিনিষ নিজের জন্য পছন্দ করনা তা অপরের জন্যও পছন্দ করবেনা। তুমি পূর্বের সবকের মধ্য হতে যখন একটি সবকও মনে রাখনি তখন অন্য সবক নিয়ে কি করবে? এরপর হ্যরত খাজা আর একটি ঘটনা বললেন। এক বুজুর্গ ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন। নামায, রোয়া ও অজিফা হচ্ছে ফরজ বা আবশ্যিক কর্ম। কিন্তু দরবেশদের প্রথম কাজ হচ্ছে ‘গওস্ত’ করা। তাঁর এ কথা অবোধ্য হওয়ায় অনেকেই তাঁর নিকট এর ব্যাখ্যা চাইলেন। তিনি বললেন ‘গওস্ত’ হচ্ছে দুনিয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা। অর্থাৎ দুনিয়া ত্যাগ করা। আর নামায, রোয়া ও অজিফা হচ্ছে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সাধারণ কর্ম। এ পথের বীরপুরূষদের প্রথম কাজ হচ্ছে দুনিয়া ত্যাগ করে গায়রূপ্লাহ হতে মুক্ত হওয়া এবং পরবর্তী কাজ হচ্ছে নামায রোজা সঠিক ভাবে পালন করা। তৃতীয় কাজ হচ্ছে অজিফা, মোরাকাবা, মুশাহেদা ও যিকির আজকারের মাধ্যমে আল্লাহতে বিলীন হয়ে থাকা। তাহলে তার বন্দেগী সঠিকভাবে চলবে

এবং ভয়ের কোন কারণ থাকবে না। প্রথম অবস্থায় মানুষের মন দুনিয়ার মুহাবাতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। এ অবস্থায় তার বন্দেগী উন্নতির সহায়ক হয়না। তাই প্রথম কাজ হচ্ছে দুনিয়ার প্রেম মন থেকে মুছে ফেলা।

হ্যরত খাজা ধিকরুল্লাহ বিল খায়ের বললেন রক্ষন কাজে কখনও কখনও পিঁয়াজ রসুন উত্তপ্ত তেলে চেলে লাল করে তার মধ্যে পানি মিশিয়ে কৃত্রিম বোল (শুরবা) তৈরী করা হয়। কিন্তু তা দেখতে বোলের মতো মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা বোল নয়। আসল বোল তো তৈরী হয় মাংস দ্বারা। প্রকৃত শুরবার (বোলে) রং না থাকলেও স্বাদে প্রমাণিত হবে সে বস্তু আসলেই বোল। অনুরূপভাবে বন্দেগীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহতে বিলীন হওয়া যা শুধু সম্ভব হয় দুনিয়ার মুহাবাত মন থেকে মুছে ফেলার মাধ্যমে। বাহ্যিক চাকচিকে কাউকে মুত্তাকি দরবেশ মনে হলেও যদি তার মধ্যে দুনিয়ার প্রেম বর্তমান থাকে তাহলে সে ঐ কৃত্রিম বোলের মতো, মাকাল ফলের মতো। প্রকৃত দরবেশ সেই যার অন্তর গায়রুল্লাহ-মুক্ত অর্থাৎ দুনিয়ার মুহাবাত শূন্য। এর অর্থ এ নয় যে সে একটা লেংটি পরে সমস্ত শরীর উলঙ্গ করে রাঙ্গায় বেরিয়ে পড়বে বা বিজন বনে আশ্রয় নিবে। দুনিয়া ত্যাগকারী ব্যক্তি সাধারণ মানুষের মতো বস্ত্র পরিধান করবে, আহার করবে এবং কাজকর্ম করবে। কর্ম হতে অর্জিত অর্থ জমা করবেনা, দান খয়রাত করে দিবে এবং নিজের অন্তরমন দুনিয়ার কোন বস্তু ও বিষয়ের প্রেমে আবদ্ধ করবে না; তাহলেই দুনিয়া ত্যাগের ফল ভোগ করতে পারবে।

-ওয়াল হামদু লিল্লাহি রাবিল আলামীন

টীকা ভাষ্য:

তাওয়াকুল: সকল কাজে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতাই হচ্ছে তাওয়াকুল। পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় তাওয়াকুল সম্পর্কে উল্লেখ আছে, “তারা বিমুখ হলে আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্যকোন উপাস্য নেই, আমি তারই উপর নির্ভর করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি”- (সূরা তাওবা: ১২৯)। বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) মসজিদে নববীতে একদল গৃহহীন, সংসার বিরাগী, ধ্যানমগ্ন সাহাবাকে আল্লাহর নির্দেশে সর্বক্ষণ অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বিশ্বনবী (দ.)’র নিকট থেকে এলেম তলব করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) প্রয়োজনে তাঁদেরকে জিহাদে এবং ধর্মপ্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করতেন। তাঁদের নিকট কোন প্রকার অর্থ-সম্পদ ছিল না। এমনকি

সর্বাঙ্গ আবৃত করার মতো পরিধেয় বস্ত্রও তাঁদের থাকত না। তাঁরা আল্লাহর ইবাদতে এতো বেশি নিমগ্ন থাকতেন যে নিয়মিত আহারের সঞ্চান করার মতো সময়ও মিলত না। কেউ কেউ বিশ্বনবী (দ.)’র নির্দেশনায় তাঁদের জন্যে খাবার প্রেরণ করলে তাঁরা এগুলো ভাগ করেই খেতেন। হজুর (দ.)’র গৃহ থেকে প্রায়শ যে খাবার প্রেরণ করা হতো তাও তারা ভাগাভাগি করে খেতেন। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা কখনো কারো নিকট থেকে কোন কিছু চাইতে পারবেন না। তাঁদের জাগতিক কোন প্রয়োজন অন্য কাউকে জানাতে পারবেন না। দীর্ঘ সময় অনাহারে-অভুক্ত থেকেও তাঁরা হাসি মুখে থাকতেন। তাঁদেরকে সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা আসহাবে সুফ্ফা নামে সম্মেৰ্দিত। ইসলাম ধর্মে বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) আসহাবে সুফ্ফাদের মাধ্যমে প্রধানত তাওয়াকুলের তালিম প্রবর্তন করেন।

বুজুর্গ শায়খ আলী: বুজুর্গ শায়খ আলী প্রসঙ্গে হ্যরত মাহবুবে ইলাহী যে তথ্য বর্ণনা করেছেন তাতে দেখা যায় উক্ত বুজুর্গ নিজ কর্ম সম্পাদনে এতোই একাগ্র এবং আত্মনিমগ্ন যে শহরের খলিফা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে তাঁর কোন ঝঁক্ষেপ নেই। খলিফার সঙ্গে আগত লোকটির আবেদন সত্ত্বেও পা দুটো লম্বা করে বসে তিনি জামা সিলাই করে চলেছেন। খলিফার বিষয়ে বুজুর্গের কোন প্রকার ভাবান্তর দেখতে না পেয়ে খলিফা রাগান্বিত হয়ে উঠে দাঁড়ান, তখনো পা দুটি লম্বা করে বসা অবস্থায় হাত দুটি দুঁজনের প্রতি প্রসারিত করে বুজুর্গ তাঁদেরকে জ্ঞাত করলেন যে তাদের সঙ্গে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় চাহিদা এবং প্রয়োজন থেকে এই বুজুর্গ মুক্ত হয়েছেন।

“যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ নয় তা অপরের জন্যে পছন্দ করো না। নিজের পছন্দের জিনিস অপরের জন্য পছন্দ করবে” মূলত: হ্যরত খাজা নিয়ামুন্দীন আউলিয়া (রহ.) উপর্যুক্ত কালামটি তাঁর মুরিদকে সুফি সাধনার জন্যে ‘সবক’ তথা বিশ্বাস ও কর্মনীতি হিসেবে প্রদান করেছিলেন। হ্যরত মাহবুবে এলাহী (রহ.) মানব জীচনাচারের উপর্যুক্ত নির্দেশনা আখেরী নবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)’র বিদায় হজের ভাষণ থেকে ধারণ করে তা অনুশীলনের জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, সহীহ বোখারী শরিফে বর্ণিত হয়েছে, “গৃহকর্মীদের তাই খেতে দেবে, যা তোমরা খাও। তা-ই পরতে দেবে, যা তোমরা পরিধান করো। তাদের

সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ দেবে না, দুর্ব্যবহার করবে না। অতিরিক্ত কাজ হলে নিজেরা সাহায্য করবে”। নামায, রোজার মতো ফরজ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের সাম্যনীতির অন্যতম বাণী “নিজের পছন্দের জিনিস অপরের জন্য পছন্দ করবে” নৈতিক বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অনুশীলনে কার্যকরে উদ্যোগী হবার আহ্বান ছিল মুরিদের প্রতি হযরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)'র প্রত্যক্ষ নির্দেশনা। কিন্তু উক্ত মুরিদ হযরত মাহবুবে ইলাহীর মূল সবক ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি মুরিদকে অন্য সক্ব প্রদান বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

গাওস্ত করা: নামায, রোজা, অজিফা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশনাভুক্ত ফরজ কাজ। কিন্তু দরবেশদের প্রথম কাজ গাওস্ত করা। গাওস্ত হচ্ছে দুনিয়ার প্রেম থেকে মানব মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা। নামায, রোজা অজিফা প্রভৃতি ফরজ কর্ম সম্পাদনের সময় আল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করা কখনো সমীচীন নয়। কারণ বিনিময় প্রত্যাশা করা দুনিয়া প্রীতিরই একটি বিশেষ নীতিমালা।

বন্দেগী প্রসঙ্গ: ইবাদত বন্দেগী বিষয়ে হযরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) মাংস রঞ্চন কাজে ব্যবহৃত পিয়াজ, রসুন, তেল, পানির সমন্বয়ে সৃষ্টি ঝোলের (শুরবা) উপমা উপস্থাপন করে মাংসকে প্রকৃত এবং ঝোলকে কৃত্রিম আখ্যায়িত করেছেন। বন্দেগীর প্রধান শর্ত হচ্ছে প্রকৃত তথা মূলের মধ্যে বিলীন হওয়া। এক কথায় আল্লাহতে বিলীন হবার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়ার মুহূর্ত মুক্ত হবার প্রধান শর্ত। যারা বাহ্যিক চাকচিক্য তথা পোশাক বেশভূষা এবং কথা-বার্তা-আলাপ চারিতাকে ধর্মানুরাগ ও মুস্তাকী দরবেশ মনে করেন প্রকৃত অর্থে এগুলো বন্দেগীর মৌলিক শর্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। লোক দেখানো, মনভূলানো ইবাদত নসিহত হচ্ছে মাহবুবে ইলাহীর মতে মাংসের ঝোলের মতো কৃত্রিম, প্রকৃত মাংস নয়। বন্দেগীও আল্লাহতে বিলীন না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত বন্দেগী হয় না।

মুস্তাকী: এই শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মন্দ কাজ থেকে ফরহেজ বা পৃথক থাকা এবং সর্বাবস্থায় মহান স্ফুট আল্লাহ নির্দেশিত পথ ও পন্থা অনুশীলনে তৎপর থাকা।

গায়রূপ্তাহ: এই শব্দের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্যকিছুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের অবস্থা তাঙ্গদ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তাঙ্গদ অনুশীলনকারীরা আলোর পথ থেকে বঞ্চিত, এরা অপশঙ্কির আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান করে না, বরং এতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়।

এক কথায় গায়রূপ্তাহ মুক্ত অন্তর অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি মুহূর্ত শূন্য অন্তরাবস্থা সৃষ্টি করা। হযরত মাহবুবে ইলাহীর মতে উলঙ্গ অবস্থায় থাকা অথবা লেংটি পরিধান করে চলাফেরা করা, এমনকি বনে আশ্রয় নিয়ে থাকার অর্থ দুনিয়া পরিত্যাগ নয়। একজন খাঁটি দরবেশ সাধারণ মানুষের মতোই আহার গ্রহণ, বস্তাদি পরিধান এবং নিজের কার্যাদি সম্পন্ন করবেন, তবে কোন অবস্থায় তাঁর পবিত্র অন্তরে দুনিয়ার প্রতি মোহ বা আকর্ষণ থাকবে না। অর্থাৎ দুনিয়াতে অবস্থান করে দুনিয়া বিমুখ অবস্থা যেমন লোভ, লালসা, যশ-খ্যাতির পাশাপাশি ভোগ-বিলাস মুক্ত জীবন ধারণ করাকে বলা হয় গায়রূপ্তাহ মুক্ত অবস্থা।

আল-হাদিস

“খাঁটি মুসলিম সে-ই যার রসনা ও হাত থেকে মানবজাতি নিরাপদ, আর মুহাজির সেই, আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্ম থেকে দূরে সরে যায়।”

“মানবজাতি সত্যপথ পাবার পর বিপদগামী হবে না, যদি তারা (সত্য) সম্পর্কে বাক-বিতঙ্গায় লিপ্ত হয়।”

“ঈমানের তিনটি মূল: প্রথমত: যে ব্যক্তি ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে তার প্রতি অত্যাচার না করা, দ্বিতীয়ত: একটু খুঁত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে কাফের মনে না করা। তৃতীয়ত: একটি মাত্র অপরাধের জন্যে কোন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ না করা।

* বি: দ্র: আলোকধারায় উল্লেখিত হাদীসগুলো মুস্তাফা জামান আবাসী লিখিত রাসূলে করীম (দ.)'র পবিত্র জীবনী গ্রন্থ ‘মুহাম্মদের নাম’ থেকে সংগৃহীত।

সুফি মাকাম পরিচিতিঃ দেহতত্ত্ব বিশ্লেষণ আলোকধারা ডেক্স

সুবিখ্যাত হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, “ইন্নাল্লাহ খালাকা আদামা আলা সুরাতিহী”। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা’য়ালা মানুষকে আপন সূরত (বাহ্যিক চেহারা ও অভ্যন্তরীণ গুণাবলী) অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। উপর্যুক্ত হাদিস শরিফ অনুযায়ী মানব সূরত বা আকৃতি মানব দেহের গঠন সম্পর্কে পবিত্রতম সত্ত্বা মহান আল্লাহ্ ঘোষণা বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)’র পবিত্র কঢ়ে প্রকাশ পেয়েছে। মানব রূহ জাত পাক আল্লাহ্ সুবহানা তা’য়ালা নিস্ত হৃকুম। এই রূহের মৌলিক পবিত্র নাম হচ্ছে রূহল কুদ্সী। মহান আল্লাহ্ অসীম-অনন্ত পবিত্র নির্দেশ রূহের পার্থিব গৃহ তথা আচ্ছাদনের নাম ‘দেহ’। লালন ফকিরের মতে, ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’। অর্থাৎ মানব দেহ আল্লাহ্ নিজস্ব শৈলীতে গঠিত ‘খাঁচা’। ‘দেহ’ বা ‘খাঁচা’ যে নামে উল্লেখ করা হোক না কেন এটি মূলতঃ পার্থিব জগতে রূহকে আবৃত রাখে। ‘দেহ’ এবং ‘খাঁচা’ শব্দসম্মের মৌলিকত্বে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ‘খাঁচা’ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে লয় প্রাপ্ত হ্বার সম্ভাবনা সর্বাধিক। অন্যদিকে ‘দেহ’ মাটির সঙ্গে মিশে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও অনেক মানুষের দেহ এতো বেশি পবিত্রতায় স্থিত যে, তা মাটির অভ্যন্তরে হাজার বছর রেখে দেয়ার পরেও অবিকল-অবিকৃত থেকে যায়। এখানে মূলতঃ তাসাওউফ সাধনায় নিম্ন দেহের হাকীকত উপলব্ধি করার দিক নির্দেশনা রয়েছে। রূহের মতো পবিত্রতম সত্ত্বা এবং শক্তি সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজন শূচি-পবিত্র কাঠামো বা দেহ। রূহের পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্যে ইসলাম ধর্মে তাই দৈহিক পবিত্রতা অর্জন ও সাধনের বিষয়টিকে প্রাথমিক রাখা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, “নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারীফ” (সূরা কাফঃ আয়াতাংশঃ ১৬)। অর্থাৎ আমি তার ঘাড়ের শিরার চেয়েও কাছে রয়েছি। পবিত্র কোরআনে আরো উল্লেখ আছে ১. “ওয়াহ্যা মা’আকুম আইনামা কুনতুম” (সূরা হাদীদ আয়াতাংশঃ ৩)। অর্থাৎ শুরুতেও তিনি (আল্লাহ্) ছিলেন, শেষেও তিনি (আল্লাহ্) থাকবেন। ২. “ওয়া ফী আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন” (সূরা জারিয়াতঃ ২১)। অর্থাৎ, আমি তোমাদের নফসের সাথে মিশে আছি, অনন্তর, তোমরা কি দেখছ না? ৩. “সানুরিহিম আইয়াতিনা ফিল আফাকী ফী আনফুসিহিম হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা লাহু আল্লাহল হাকেকা” (সূরা হা-মিম-সিজ্দাঃ ২১-২২)।

৫৩)। অর্থাৎ, আমি আমার স্বীয় চিহ্নসমূহ জগতে ও মনুষ্য শরীরে দেখাবার নিমিত্তে প্রকাশ করেছি, উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত অবস্থা যেন তাদের কাছে প্রকাশ পায়, ৪. “ওয়া ইয়া মাআলকা ইবাদী আন্নী ফাইন্নী কারীব” (সূরা বাকারাঃ আয়াতাংশ ১৮৬)। অর্থাৎ হে নবী, আমার বান্দারা যদি আমার সম্পর্কে জিজেস করে তখন তাদের বলুন, আমি তাদের খুব কাছেই আছি। পবিত্র কোরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্ অবস্থান, আসন এবং বিদ্যমান তৎপরতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। রূহ এবং আকৃতিগত কারণে মানব শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হওয়ায় রূহের পার্থিব আবাসস্থল ‘দেহ’ বিষয়ে গুপ্ত তত্ত্বের ধারণাও উপর্যুক্ত আয়াত সমূহ থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। অতঃপর দেহের কার্যকলাপ বিষয়ে আল্লাহ্ দরবারে জিজাসাবাদ ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে,

১. “(মহা বিচার দিবসে) তোমার কান, চোখ ও মনকে জবাবদিহিতার জন্যে ডাকা হবে”- (সূরা বনি ইসরাইলঃ আয়াতাংশ-৩৬)।

২. “মহাবিচার দিবসে তাদের জিহ্বা, হাত ও পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচ্চিত শান্তি দেবেন”-(সূরা নূরঃ ২৪)।

৩. “সেদিন আমি ওদের কষ্ট রূপ্ত করে দেবো। ওদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে, ওদের চরণ সাক্ষ্য দেবে ওদের সকল কৃত কর্মের”- (সূরা ইয়া-সীনঃ ৬৫)।

৪. “ওরা ওদের ত্বককে জিজেস করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে ত্বক বলবে, আল্লাহ্ সবকিছুর ন্যায় আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে এসেছ। তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে-এই ধারণার বশবতী হয়েই তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। আর তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা করো তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন”- (সূরা হামিম-সিজ্দাঃ ২১-২২)।

তাসাওউফ সাধকরা দেহ সংযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জবাবদিহিতা বিষয়ে অবহিত থাকেন বিধায় তাঁদের কর্মজীবনে দৈহিক আচরণকে রাখেন সংযত ও সুনিয়ত্বিত। তাই প্রত্যেক তাসাওউফ সাধক মনের পবিত্রতা পূর্ণমাত্রায় অর্জন এবং

সংরক্ষণের প্রয়োজনে দেহের চাহিদা এবং ভোগ-উপভোগ বিষয়ে খুবই সকর্তৃতা অবলম্বন করেন। তাসাওউফের পরিভাষায় এটি ‘দেহ তত্ত্ব’ হিসেবে চিহ্নিত।

হাদিসে কুদ্সীতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.)'র পবিত্র জবানে ঘোষণা দিয়েছেন, “কুনতু কানজান মাখফিয়ান ফা-আহবাতু আনউরাফা, ফাখালাকতুল খালাক”। অর্থাৎ, আমি (আল্লাহ্) গুণ্ঠ ভাঙ্গারূপে মওজুদ ছিলাম। আপনাকে প্রকাশ করার নিমিত্তে সকল কিছু সৃষ্টি করে প্রকাশ হলাম। উপর্যুক্ত হাদিস অনুযায়ী পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহ্ প্রকাশ। এ বিষয়ে মানুষের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, “আল-ইনসানু সিররী ওয়া আনা সিররুহু”। অর্থাৎ মানুষ আমার রহস্য, আমি মানুষের রহস্য। ‘তাখল্লাকুম বি আখলাকিল্লাই’—অর্থাৎ আল্লাহ্ রঙে রঞ্জিত হও। উপর্যুক্ত হাদিস শরিফসমূহে মহান স্রষ্টা নিজের প্রকাশ, মানব এবং স্বয়ং আল্লাহ্ র মধ্যে পারস্পরিক রহস্যপূর্ণ সম্পর্কের ধারণা প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন এবং হাদিস শরিফের নির্দেশনা অনুযায়ী মানব হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্ এক অনন্ত রহস্য।

সূরা হা-মীম-সিজদা'র ৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের চিহ্নসমূহ মানব দেহে দেখাবার নিমিত্তে যে ঘোষণা দিয়েছেন এবং পবিত্র কোরআনে মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জবাবদিহিতা বিষয়ে যে সকল সর্তকবাণী প্রদান করা হয়েছে তারই আলোকে সুফিদের সাধনা গড়ে উঠেছে দেহকে কেন্দ্র করে। দেহের মধ্যে দেহাতীত সাধনা, সীমার মধ্যে অসীমের সাধনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সুফি সাধকদের সাধনা জগৎ। ইসলাম ধর্মে তাই দৈহিক পবিত্রতা অর্জন, শূচিতা পালন ফরজ বিধানের অন্তর্গত বিষয়। নিয়মিত অজু-গোসল সম্পন্ন করে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে দেহকে ভাল কাজে নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যে তৎপরতা চালানোতে রয়েছে দেহের সাধনা জগৎ। দেহকে কল্যাণমূলক কাজে গতিময় করার পাশাপাশি সকল প্রকার অবৈধ অকল্যাণমূলক কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টার সঙ্গে দৈহিক সাধনা জগৎ সংশ্লিষ্ট। বেলায়তের স্মার্ট হ্যরত আলী (ক.) রংক্ষেত্রে ভূপাতিত শক্তির বুকে চড়ে হত্যার উদ্যোগ নেয়ার সময় পরান্ত শক্তি মওলা আলী (ক.)'র পবিত্র মুখাবয়বে থুথু নিক্ষেপ করা মাত্র তিনি শক্তির বুক থেকে নেমে পড়েন। অর্থাৎ মওলা আলী (ক.) জিহাদের জোশকে ত্রোধের রূপে নিতে না দিয়ে পবিত্র হস্তদ্বয়কে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে পরম দৈহিক সংযমের অনুকরণযোগ্য ইতিহাস রেখে যান।

তাসাওউফ পঞ্চায় ‘দেহ’ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উৎস মন ও মেজাজ। মন এবং মেজাজের পরিচালনা কেন্দ্র হচ্ছে ‘রূহ’। তাই রূহের কল্যাণমূখি গতিধারার সঙ্গে দেহের পরিচালনা ব্যবস্থা নির্ভরশীল। রূহে হাইওয়ানী ধারা তৎপর থাকলে দেহের পরিচালনা সর্বাবস্থায় সকল কর্মে অপরাধ, অন্যায়কে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। এ কারণে তাসাওউফ সাধকরা মানব দেহকে আলম-ই সঙ্গীর বা ছোট বিশ্ব এবং বিশ্বজগতকে আলম-ই কবীর তথা বড় বিশ্ব হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। আলম-ই-কবীরে অগ্রবর্তী হ্বার পূর্বে তাসাওউফ সাধকরা আলম-ই-সঙ্গীরে নিজেকে মনোনিবেশ এবং তৎপর রাখেন। এখানে মূলত: দেহের মাধ্যমে নফস, নফসের মাধ্যমে রূহ এবং রূহের মাধ্যমে মহান জাতে পাক আল্লাহকে জানার এবং পাবার বিভিন্ন তালিম তাসাওউফ সাধকগণ স্ব স্ব পীর-মুর্শিদের নিকট থেকে লাভ করে থাকেন। এই তালিমকে গুণ্ঠ বা সিনা-ব-সিনা তালিম বলা হয়। ইসলাম ধর্মে হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) এই ধারার মূল প্রবর্তক। হ্যরত আলী (ক.) হিজরতের সময়ে বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র বিছানায় শয়ন করে এবং হ্যরত আবু বকর (রা.) সওর গুহায় সংগোপনে তিনি দিবারাত্রি একান্তে অবস্থান করে তাসাওউফের শীর্ষ মাকাম বেলায়তের তালিম প্রাপ্ত হন।

তাসাওউফ গবেষকদের কেউ কেউ বৌদ্ধ সহাজিয়া, নাথপট্টী শৈব মতাবলম্বী, কামরূপী যোগী এবং বৈষ্ণব সহাজিয়াদের প্রভাবে সুফি ভাবধারায় দেহতত্ত্ব গড়ে উঠেছে বলে ধারণা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি বন্ধনিষ্ঠ নয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক সময়ে আসহাবে সুফিদের কষ্টসাধ্য সাধনারীতি, হ্যরত ওয়ায়েজ করণীর মতো কঠিন রিয়াজতে নিময় আউলিয়া, হ্যরত ইব্রাহীম আদহাম, হ্যরত রাবেয়া বসরী, হ্যরত মনসুর হাল্লাজের সুকঠিন রিয়াজত ধারা, যোগী, বৈষ্ণব, শ্রমনদের সাধনারীতির সঙ্গে পরিচিতি লাভের অনেক পূর্বেই তাসাওউফ জগতে দৃশ্যমান ছিল। হয়তো তাসাওউফ সাধনারীতির কোন কোন ধারার সঙ্গে ভিন্ন ধর্মাচারীদের সাধন মর্গের মিল হলেই ঐ পঞ্চাকে ইসলাম ধর্মের তাসাওউফ সাধনার বহিঃভূত বিষয় হিসেবে অভিহিত করা অথবা ধারা করা বলে উল্লেখ করা যুক্তিসংজ্ঞত নয়। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হ্যরত খাজা সৈয়দ মঈনুন্দীন চিশতী (ক.) ভারতবর্ষে আগমনের পথে আফগানিস্তানে অবস্থানকালে বৌদ্ধধর্মানুসারী ভিক্ষুদের সঙ্গে সাক্ষাত-পরিচয় হয়। এ সময় তিনি বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণ বিষয়ে ধারণা প্রাপ্ত হলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবহিত করেন যে, নির্বাণ অবস্থার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের তাসাওউফ পঞ্চায় ফানাফিল্লাহ্

সঙ্গতি রয়েছে। তবে ইসলামের তাসাওউফ বিষয়ে ‘বাকাবিল্লাহ’ তথা আল্লাহতে স্থিতি লাভকে সর্বোচ্চ মাকাম হিসেবে গণ্য করা হয়। তাসাওউফ সাধকরা নিজেদের দেহ সংশ্লিষ্ট হত, পদ, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু এবং প্রত্যঙ্গ সমূহের হেফায়ত সাধনে তৃরিকতের নির্দেশনা মোতাবেক অনুশীলনের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করেন। দেহতত্ত্ব বিষয়ে ইসলাম ধর্মের তাসাওউফ সাধকরা অন্যকোন সাধন-ভজন ধারা অনুযায়ী প্রভাবিত হননি। এ ছাড়া দৈহিক কৃচ্ছ্রতা সাধনের সাধারণ বিধিবিধান আখেরী নবী, বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (স.) নির্দেশিত নিয়মিত আচার, অভ্যাস, আরাধনা রীতি-নীতিতে বর্ণিত আছে।

ইসলামের তাসাওউফ সাধনার বিষয়টি অতি সংগোপনে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাসাওউফ সাধনার জন্যে গুপ্ত তালিম, ইলম, কাশ্ফ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং অনুশীলনে লোক দেখানোর কিছু নেই। উক্ত সময় থেকে সবর-শোকর এখতিয়ার করে লোকচক্ষুর অন্তরালে তা সম্পন্ন করা হয়। এটির প্রধান লক্ষ্য দৈহিক শক্তিকে পরান্ত করে আত্মশক্তি তথা রুহের অবস্থানকে সুদৃঢ় ও স্থিত করা। অর্থাৎ দেহ চালিত হবে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র রুহের নিয়ন্ত্রণে। মানব সৃষ্টির সঙ্গে আব (পানি) আতশ (অগ্নি) খাক (মাটি) বাত (বাতাস)-এর পাশাপাশি নূর এবং রুহ তথা সাফার সংযুক্তি রয়েছে। উপমহাদেশের প্রথ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, তত্ত্বজ্ঞানী আউলিয়া হ্যরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) মানব সৃষ্টির উপাদান বিষয়ে উপর্যুক্ত তথ্যে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন।

তাসাওউফ গবেষকদের মতে মানুষের মধ্যে আলম-ই-আমর এবং আলম-ই-খালক নামে দুই প্রকার লতিফা তথা সুস্ক্ষম বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে; (ক) আলম-ই-আমরঃ কল্ব তথা হৃদয়, রুহ, সির, খক্ষী এবং আখফা তথা অন্তর্নিহিত অতি সুস্ক্ষম গোপন এবং অদৃশ্য শক্তি সংযুক্ত বিষয়। (খ) আলম-ই-খালকঃ নফ্স (প্রকৃতি), আব (পানি), আতশ (অগ্নি) খাক (মৃত্তিকা) এবং বাত (বায়ু) সম্পৃক্ত বিষয়। নফ্স রুহের প্রকাশ এবং ভৌতিক মানব দেহ হচ্ছে রুহের প্রকাশ স্থান। বিভিন্ন তৃরিকত পন্থায় এ সকল বিষয় লতিফা হিসেবে পরিচিত। তৃরিকা ভেদে দেহ তত্ত্বের বিন্যাসে এগুলোর ক্রমিক সংখ্যা অভেদ নয়।

দেহতত্ত্ব অনুযায়ী দেহের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুই সুফি সালিকের জ্ঞাত বিষয়। মানব দেহে পাঁচ প্রকার নফ্সের স্থান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে নফ্সে আম্বারাহ (নিম্নতরের পশ্চ প্রবৃত্তি যা পবিত্র কোরআনের ভাষায় ‘আস্ফালাস সাফেলীন’ তথা

হীনতা পংকিলতার সর্বনিম্ন স্তর)। নফ্সে মুতমাইন্না লাভ না করা পর্যন্ত তাসাওউফ সাধককে নফ্সে লাওয়ামা, নফ্সে মোলহেমা অতিক্রম করতে হয়। নফ্সে মুতমাইন্না অর্জিত হলে নফ্সে রহমানীতে উন্নীত হওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, নফ্সে লাওয়ামা হচ্ছে স্বীয় কর্ম এবং পাপ সম্পর্কে অনুত্তাপ অনুশোচনায় দ্বন্দ্ব হয়ে নিজেকে নিজে তিরক্ষার করা। নফ্সে মোলহেমা হচ্ছে ভাল-মন্দ কাজের প্রতি নির্দেশ প্রাপ্ত অবস্থা। নফ্সে মুতমাইন্না হচ্ছে শান্তি এবং পরিপূর্ণতার অবস্থান। নফ্সে রহমানী তথা মহান আল্লাহর অশেষ করণা প্রাপ্ত অবস্থানে না পৌছা পর্যন্ত সাধকের বিরামহীন অক্লান্ত চেষ্টা অব্যাহত থাকে। নফ্স সম্পর্কিত বিরুণীতে কেউ কেউ (ক.) নফ্সে রাদিয়া (আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট), (খ.) নফ্সে মারদিয়া (স্বয়ং আল্লাহ যে নফ্সের উপর সন্তুষ্ট), (গ) নফ্সে কামিলা খোদার গুণে গুণান্বিত বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। তবে নফ্সের উপর্যুক্ত তিনটি স্তরকে নফ্সে রহমানীর অন্তর্ভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন।

মানব দেহ এবং সংশ্লিষ্ট নফ্সের ক্রমোন্নতি প্রধানত রূহের নিয়ন্ত্রণাধীন। রূহ আলমে খালকের অন্তর্গত নয়। অর্থাৎ নফ্সের (প্রবৃত্তির) অন্তর্গত নয়। রূহ উর্ধ্বস্তরের প্রাণ-প্রবাহ যা আলম-ই-আমরের অন্তর্গত শক্তি। এটি সৃষ্টিশীল অমর শক্তি, এটি জাতে পাকের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। রূহ হাকিকী শক্তি যা মূলতঃ অদৃশ্য এবং গুপ্ত, তবে অনুধাবন যোগ্য। রূহ প্রকৃত অর্থে আল্লাহর শক্তি। অন্যদিকে নফ্স প্রকাশ্য যা মানুষের কর্মপ্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাসাওউফ সাধকরা রুহের পাঁচ রকম পরিচিতি প্রদান করেছেন। এগুলো হচ্ছে; (১) রূহ জামদানী (অজৈব পদার্থের প্রাণ-প্রবাহ বা ধাতু আত্মা) (২) রূহ নাবাতী (বৃক্ষলতাদির প্রাণ শক্তি বা বৃক্ষ আত্মা) (৩) রূহ হাইওয়ানী (পশু আত্মা), (৪) রূহ ইনসানী (মানবাত্মা), (৫) রূহল কুদ্সী (পবিত্রাত্মা)।

মহান আল্লাহ আদম সৃষ্টির পর আদমের কলবে রূহল কুদ্সী ফুঁকে দিয়ে সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাভুক্ত করেছেন। মানব আকৃতি ধারণ করে পৃথিবীতে আগমনের পর এই আত্মা ‘রূহ ইনসানী’ তথা মানবাত্মা হিসেবে অধিকতর পরিচিতি পায়। মানবিক গুণাবলী হারিয়ে গেলে তা রূহ হাইওয়ানীতে বিলীন হয়, যা মানবিক গুণাবলীর শূন্যতায় সৃষ্টির মধ্যে হীনতম হিসেবে ধীরুত্ব হয়। তাসাওউফ সাধনার মূল বিষয় হচ্ছে রূহ ইনসানীকে সমৃদ্ধ করতে প্রাণপন চেষ্টা অব্যাহত রাখা। কারণ রূহল কুদ্সী ধারণের মধ্যে রয়েছে ইনসানে কামিল হবার গৌরবময় পূর্বশর্ত।

মানব দেহ সুকঠিন রিয়াজত, কৃচ্ছ্রতা সাধন, সকল প্রকার

হিংসা, লোভ, কামনা-বাসনা মুক্ত হয়ে এবং কামিল শায়খের দিব্যদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবতীয় অনর্থ পরিহার করে পরিপূর্ণ সংযম সাধন করে রূপ্তল কুন্দসী'র অন্তর্ভুক্ত হলে মহান আল্লাহর বন্ধু (অলি) হিসেবে স্বীকৃত হন। এ স্তরের বান্দার বিষয়ে দ্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, “ইন্নাল্লাহ তায়ালা কালা মান আদালী ওয়া লিয়া ফাকাদ আজানতুহ বিল হারবে ওয়ামা তাকারবা ইলাইয়া আব্দী বি শাইয়িন আহার্বা ইলাইয়াম্মাফ তারাজতু আলাইহে.. ওয়ামা ইয়াজলু আব্দী ইয়াতাকাররাবো ইলাইয়া বিন নাউয়াফিলে হাত্তা আহবাবতুহ ফাইজা আহবাবতুহ, ফাকুন্তু সাময়াত্তল্লায় ইয়াসমায়ু বিহী ওয়া বাসারত্তল্লায় ইয়াবসির বিহী ইয়াদাত্তল্লাতি ইয়াবতিশ বিহী ওয়া রিজলত্তল্লাতি ইয়ামশি বিহা”-অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আমার কোন গুলীর সঙ্গে শক্রতা পোষণ করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি এবং বান্দা যদি কোন কিছুর মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে যা আমি তার উপর ফরজ করেছি-তা আমার নিকট প্রিয় এবং যখন আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তখন আমি তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করি, এই সময় আমি তাকে এমনভাবে বন্ধু বলে গ্রহণ করি যে, আমি তার কর্ণ হই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে; আমি তার চক্ষু হই, যদ্বারা সে দর্শন করে; হস্ত হই, যদ্বারা যে ধারণ করে; আমি তার পদ হই, যদ্বারা সে হেঁটে বেড়ায়”।

মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব যখন উপর্যুক্ত কালামের আদলে স্বীয় নফস এবং দৈহিক কাঠামো পৃণ্যময়তায় সুস্থিত করে আল্লাহর বন্ধুতে পরিগণিত হন তখন তাঁদের পবিত্র হস্ত আল্লাহর হস্তে পরিণত হয় বিধায় মাইজভাণ্ডুর দরবার শরিফের শাহী পুকুর ঘাটে বসে ওজু করার কালে জজব অবস্থায় গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডুরী কেবলা আলমের পবিত্র হস্তে পুকুরে নিষ্কণ্ঠ বদনা ৪২ মাইল দূরে রাঙ্গুনীয়ার কোদালা পাহাড়ে উদ্বিদুত বাঘের মুখে পতিত হয়। দেহের পবিত্রতা এতেই সুস্থ ন্তরে উজ্জাসিত যে, মাইজভাণ্ডুর শরিফে স্বীয় হজরা শরিফে অবস্থানরত অবস্থায় পবিত্র কা'বা শরিফে গাউসুল আয়ম হ্যরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডুরী (ক.)-কে ইবাদত রত দেখা গেছে। একই সঙ্গে চট্টগ্রামের দেয়াং পাহাড়ে রেয়াজতকালীন ভ্রমণরত অবস্থায় গাউসুল আয়ম বিল বিরাসত হ্যরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডুরী (ক.)'র নিকট এক ভক্ত স্বর্ণ প্রস্তরের তালিম প্রার্থনা করলে তিনি পাহাড়ী বৃক্ষের একটি পাতা ভজ্জের হাতে দিয়ে তা সিদ্ধ করে রস থেকে স্বর্ণ তৈরীর উপাদান জানিয়ে দেন। উক্ত ভক্ত বাবা ভাণ্ডুরী কেবলার নির্দেশ মতো তা সম্পন্ন করেন এবং খাঁটি স্বর্ণ প্রস্তরে সক্ষম হন। পরবর্তী সময়ে একই বৃক্ষের পাতা দিয়ে উক্ত ভক্ত একই প্রক্রিয়া অনুশীলন করে স্বর্ণ প্রস্তরে বিরামহীন চেষ্টা চালানোর

পরেও স্বর্ণ প্রস্তর করা সম্ভব হ্যনি। বাবা ভাণ্ডুরী কেবলার পবিত্র হস্ত এবং ভজ্জের হস্তের পার্থক্য এখানে লক্ষ্য করা যায়। এটি নিয়ামক সত্য যে, মহান আল্লাহ প্রেরিত নবী-অলিদের পবিত্র দেহ কখনো কীট পতঙ্গ এবং মাটি ভক্ষণ করেন। এই দেহে কখনো পচন ধরে না। এরই নমুনা ইসলামের ইতিহাসের নানা ঘটনা পঞ্জীতে বারংবার প্রদর্শিত হয়েছে। পানি প্রবাহের জন্যে আমীর মোয়াবিয়ার শাসনামলে একবার ওহুদ প্রান্তরে খনন কাজ করতে হয়। এই কাজ করার সময় শহীদুশ শোহাদা হ্যরত আমীর হামজা (রা.)'র কবরও খনন কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। খনন কাজের সময় কবর খোলার পর হ্যরত আমীর হামজা (রা.)'র পবিত্র দেহ উত্তোলন করা হলে দেখা যায় তাঁর পবিত্র দেহ যেভাবে সমাহিত করা হয়েছে অবিকল-অবিকৃত অবস্থায় তা বিদ্যমান রয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবা হ্যরত হুজাইফা (রা.) এবং জাবের (রা.) সমাহিত হয়েছিলেন ইরাকে। প্রায় তেরশ বছর পর ১৯৩২ সালে বারংবার স্বপ্নদিষ্ট হয়ে ইরাকের রাজার নির্দেশে এবং বাগদাদ শাহী মসজিদের খতিবের পরামর্শে তাঁদের কবর খোলা হলে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় নতুন কাফনে আবৃত পবিত্র দেহ উত্তোলন করলে দেশী-বিদেশী দর্শক, পর্যবেক্ষক এবং উপস্থিত জনতা লক্ষ্য করেন যে, পবিত্র শব দুটি যেন মাত্র ঘন্টা দুই/তিনেক পূর্বে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। এই অভুতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করে উক্ত সমাবেশে উপস্থিত অনেক খ্রিস্টান এবং ইহুদী তৎক্ষনিকভাবে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের পবিত্র দেহ মানবজাতির হেদায়তের আলোকবর্তিকা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকে। কারণ এই স্তরের পুন্য দেহ কখনো ভঙ্গীভূত হয় না-মাটিও এই দেহকে পরিপূর্ণভাবে মর্যাদাভুক্ত করে পরম আদরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখে। ইসলাম ধর্মের তাসাওউফ সাধনায় দেহ তত্ত্বের বিশেষত্ব এখানে নিহিত রয়েছে। তাসাওউফ সাধনায় নিময় মানুষ প্রেমের আগুনে দক্ষ হয়ে দেহকে পবিত্র করতে সক্ষম হয় মাঝুক পানে আশিক হ্যবার কারণে। আর আশিকের দেহের গঠন এবং এর মধ্যে প্রেমের উত্তাপ বর্ণনায় এনে উর্দু কবি মির্জা মুহাম্মদ রফি লিখেছেন:

আদম কি জিম্ম জাব কি আনাসির সে মিল বানা,
কুছ আগ বাচ রহি থি সো আশিক কা দিল বানা ॥
অর্থাৎ, পাঁচটি সুস্মবন্ত নিয়ে মানব শরীর গঠিত। তবে এর মধ্যে কিছু আগুন বেঁচে যায়, এ আগুন দিয়ে সৃষ্টি হলো প্রেমিকের হৃদয়।

উল্লেখ্য যে মাইজভাণ্ডুরীয়া তুরিকায় দৈহিক সাধনার জন্যে সম্পূর্ণ পদ্ধতি অনুশীলনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি অর্জন করা যায়।

‘আয়নায়ে বারী’ কিতাবের ভাবার্থ এস এম এম সেলিম উল্লাহ

(পূর্ব প্রকাশিতর পর)

বর্ণিত আছে যে, একদা রাসুলে করীম (দ.) আপন সাহাবী (রা.)-গণকে নিয়ে মজলিশের দীপ্তি বৃদ্ধিকারী হয়ে তাশ্রিফ রাখলেন ও নিজের পবিত্র চেহারার সূর্যোজ্জ্বল প্রভাবে সকল আশেকানদের শাহী মহলকে সুহাসিনী ভোরের আলোসম ওজ্জ্বল্যময় করলেন। হঠাৎ ওখানে অভিশপ্ত আবু জেহেল এসে পড়ল ও হ্যরত (দ.)'র চেহারায়ে আনোয়ার দেখে বলল, কেমন বদ্কার চেহেরা (নাউয়ুবিল্লাহ)। এই সময় খোদার কুদ্রতে আকস্মিকভাবে প্রেম দন্ধন্তর হ্যরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)ও তশ্রিফ আনলেন। আর হ্যরত (দ.)'র নূরানী জ্যোতিষ্পয় মুখাবয়ব দেখেই পতঙ্গবৎ উৎসর্গিত হয়ে বলে উঠলেন- আমার মন-প্রাণ ও আমার পিতা-মাতার মন-প্রাণ আপনার উপর কোরবান বা উৎসর্গিত, কেমন সুদর্শন চেহেরা এবং খোদা দেখার আয়না! সাহাবা (রা.)-গণ প্রেমাঙ্গদের প্রণয়াসক্ত হ্যরত সিদ্দীকে আবকর (রা.) ও অভিশপ্ত আবু জেহেল-এর পরম্পর বিরোধী কথা শুনে বিহুলতার আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে ‘হ্যরত রেসালতে মাঝাব আলাইহিস সালাতু রবিল আরবায়ে’র কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, একই চেহারায়ে আনোয়ারকে দেখে সিদ্দীকে আকবর (রা.)'র সত্য ভাষ্যকারী মুখে এই সুবাক্য প্রকাশিত হল। আর অভিশপ্ত আবু জেহেলের মুখ থেকে কেন তার বিপরীত ও উল্টো কথা প্রকাশ পেল? এ সময় হ্যরত রাসুলে পাক (দ.) বললেন, “আমার জাত বা সন্তা হচ্ছে খোদা তাঁয়ালার আয়না-দর্পণ, প্রত্যেকেই আপন আপন বাতেনী অবস্থার প্রতিবিম্ব আমার মধ্যে পরিদর্শন করে। সিদ্দীকে আকবর ঈমানী বাতেনী সুরত পরিদর্শন করলেন, তখন আপন ঈমামের প্রেম বাগানের আশেক হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত বুলবুল স্বরূপ প্রেম স্বত্বাবে প্রেমের সুবাক্যের সাথে সাথে গীতি কীর্তিবাস হলেন। কেনই বা হবেন না? রাসুলে মকবুল (দ.) নিজেই বলেছেন যে, “যদি দুনিয়ার সকল মুমিনের ঈমান দাঁড়িপাল্লায় একদিকে রাখা হয় আর সিদ্দীকে আকবর (রা.)'র ঈমান একা অন্যদিকে রাখা হয়, তবে নিশ্চয় সিদ্দীকে আকবর (রা.)'র ঈমান অগ্রগত্য ও জয়ী হবে, সকল ঈমানওয়ালাদের ঈমান অপেক্ষা”। একইভাবে অভিশপ্ত আবু জেহেল ও নিজের কুফুরির বাতেনী চেহেরা দেখা মাত্রই

বিষণ্ণতায় অসত্য বন্য প্রকৃতির বাক্য বলে উঠেছে।

মসনবী:

কেননা বেখুদ পূর্ণরূপে বিনাশ হয়েছে;
আপন সন্তা বিনাশি পূর্ণ “হক” হয়েছে।
নিজের সুরত বিহীন হয়ে আয়না বনেছে;
যার মধ্যে আপন ছবি দৃশ্যত হয়েছে।
তাতে যে দিলো থুক, তা নিজের উপর দেওয়া;
তাতে করলে প্রহার ঠিক নিজে মার খাওয়া।
মন্দ যে দেখিল তবে তা নিজের প্রতিকৃতি;
ভাল যে দেখিল তাও নিজেরই আকৃতি।
নির্মল সে সব ক্রটি হতে কল্যামুক্ত চের,
সম্মুখে তাই ছবি তোমার উপস্থিত হয় চের।
সোবহান আল্লাহ “সবনে মাস্তানা” বা উন্নাদ সদ্শ
কার্যকলাপের আলাপ চলছে; বেগানা বা সম্পর্কহীনদের থেকে
“মাহফুয়” বা নিরাপদ হয়ে যাও।

কবিতা:

এ অবস্থানে পৌছতেই সর্ব কথা লুঙ্ঘ হয়;
এ অবস্থানে পৌছতেই কলম ভেঙ্গে চূর্ণ হয়।
মুখ সামলাও, করোনা তুমি বাকপটুতার আর্তনাদ;
প্রতিক্ষণে বল “ওয়াল্লাহ আলামু বির রাশাদ”।
[অর্থাৎ পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাতা।]

দ্বিতীয় পরত: ইহাতে হ্যরত (রা.)'র বরকতময় বিলাদত বা শুভ আবির্ভাবের বর্ণনা-এবার হ্যরত গাউসুল্লাহলি আয়ম, মাহবুবে হক, নুর নুরে আলম (রা.)'র শুভাবির্ভাবের বর্ণনা দিলের মধ্যে পূর্ণ আদবে রেখে দিলের কানে শ্রবণ করুন এবং সুবিন্যস্ত আত্মার বোধ-বুদ্ধি ও মগজ-মন্ত্রকে দিল আকর্ষী, বিশ্বাস দৃঢ়কারী শুরুত্বপূর্ণ এ যিকিরের পবিত্র সুবাসে সুবাসিত ও সুরভিত করুন।

গজল:

কলম হতে গাউসে মাইজভাওরীর যে নাম বাহির হয়;
ফিরিষ্টা ঐ রত্নবর্ষী কলম চুম্বনকারী হয়।

শুনতেই আমার প্রেমাঙ্গদের ঐ যে পবিত্র নাম,
প্রত্যেকটি প্রাচীর দ্বারের অতিমাত্রায় শিরু নত রয়।
খোশ্বর্ণক মিষ্টি ভঙ্গি মিষ্টভাষী ঐ প্রিয়া,
প্রেমাঙ্গদের বকালকায়ও আশ্চর্য আস্থাদন রয়।
গাউসে পাকের প্রশংসা যখন আমার কবিতার মগজ,
ঐ কবিতা হবে না কেন মেশ্ক আস্থারের সুভাসময়।
নামে পাকে গাউসুল আয়ম যে কবিতায় বিরাজমান,
ঐ কবিতা চিনি-মিছরি থেকে কেন নয় বেশি পছন্দসই।
ছল-ছাতুরী দেখায় কেমন দেখ আমার বন্ধুগণ,
আয়মতের রাজদুর্ত আমার সুলতানে মাইজভাওর হয়।
যেই দেখেছে গাউসে পাকের খঞ্জরময় ঝংকুঞ্জন,
ঐ কৃপানে হয়েই গেছে মন ভোলাময় নিঞ্জিয়।
সে প্রিয়ার আশেক হতেই ইজত হুরমত সব গেল,
ভোগ বিলাস টুট্টল আর বন্ধন কাট্টল ইষ্ট আলয়।
দ্বীন ঈমান সব গেল টুটে দুই কূলে হলাম স্বাধীন,
বাকা (কুন্তল রাশির) ফাঁদে বন্দি হতেই মোর হৃদয়,
তামাম জাহান গেল টুটে হ্যারতের প্রেমেরই শোকর,
হে মহান প্রেম থেকো তুমি প্রেমাঙ্গদের নিশান হই।

দীপ্তি:

দীপ্তিমানের দয়ার দীপ্তি বিষ্঵ পড়তেই মম অন্তরে,
তখন থেকেই অন্তর আমার নূর উদয়ের কেন্দ্র হয়।
যে অবধি নূরী মুখের নকশা মম হৃদয়ে অংকিত হয়,
তবে থেকেই বন্ধুগণ মোর অন্তরে রহস্যের ধনাগার হয়।
যিকির-আয়কার তাসবিহ-তাহলিল কর্মাধিক্যে কী করব আর,
প্রিয়ার নামের জপরে মালাই যিকির কার্যবহি হয়।
জাগ্নাতি নিয়ামতের কোন নেইকো লিঙ্গা বন্ধুগণ,
প্রেমাঙ্গদের অলি-গলি সর্বাধিক মোর প্রিয় হয়।
দোজখের ভয় নেইকো আমার মনে কেবল বিচ্ছেদ ভয়,
গাউসে মাইজভাওরীর যবে পদ চিহ্ন গোলাম হই।
দৃষ্টি আকর্ষী হও রে মকবুল সকল থেকে হয়ে ভিন্ন,
গাউসে মাইজভাওরীর; যিনি কুল মালমের দয়াময়।
এটা স্পষ্ট যে, হ্যারত ঝংহুল আরেফিন (আরেফগণের আত্মা),
ফখরুল মোতাকাদিমিন ওয়াল মুতায়াখথিরিন, (পূর্ববর্তী ও
পরবর্তীগণের গৌরব), সুলতানুল মুকার্রবিন
(নৈকট্যপ্রাণ্গণের সম্মাট), মওলায়ে আলম (জগতের মওলা),
গাউসুলাহিল আয়ম মাইজভাওরী রাদিয়া আনহুলাহুল বারীর
পবিত্র জন্মভূমি বাংলাদেশের অন্তর্গত সুসজ্জিত অভিজাত

ইসলামাবাদ প্রকাশ বরকতপূর্ণ চট্টগ্রাম শহরের অন্তর্গত
ফটিকছড়ি থানার ঈর্ষনীয় পুস্পোদ্যানময় মাইজভাওর শরিফ
মৌজায়।

বন্ধুগণ, চট্টগ্রাম শরিফ এমন পবিত্র শহর যেখানে সহস্র
আউলিয়ায়ে কেরাম (রিদোয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন)
বেলায়তে ওজমার প্রভাবে নিয়ামত ওয়ালা হয়েছেন। যেখানে
লক্ষ লক্ষ খোদার আশেক হেদায়তের পথে মোশাহেদাকারীগণ
চিল্লা করেছেন, মেনে নিতে হয় যে, চট্টগ্রাম শরিফ গারে হেরা
বা হেরাগুহার সদৃশ থায়ের-বরকতে ভরপুর। চট্টগ্রাম
ওলামায়ে আরেফীনের (খোদার পরিচয় লাভকারী আলেম)
মানজিল বা থামিবার স্থান। চট্টগ্রাম ফোজলায়ে কামেলীনের
(সুবিজ্ঞ কামেলীন) উৎসঙ্গ। এ চট্টগ্রামই নিপুণ জ্ঞানীদের
খনি। চট্টগ্রাম দানবীরদের মূল উৎস। চট্টগ্রাম
কবি-সাহিত্যিকদের ভাওর। চট্টগ্রাম ফকীরদের আশ্রম
(আশ্রয়স্থল)। চট্টগ্রাম গরীবদের আশ্রয়স্থল। চট্টগ্রাম ভবঘুরে
নিরাশ্রয়দের স্বাচ্ছন্দ্যস্থল। চট্টগ্রাম বেদনাক্লান্ত ব্যথীর ব্যথা
প্রশমনকারী। চট্টগ্রাম স্বর্গীয় কাননে সূক্ষ্ম মর্যাদা দানকারী।
চট্টগ্রাম ঈর্ষনীয় স্বর্গোদ্যানের মিলনায়তন।

পংক্তি:

চট্টগ্রামের সুখ্যাতি শুনে বেহঁশ হবে রিদোয়ান,
যে স্থানেই চট্টগ্রামের করে কেহ গুণগান।
লক্ষ মুখ চাই কলম তব করতে এ গুণের বর্ণনা,
দু'মুখে আর কী বর্ণিবে চট্টগ্রামের গুণগান।

গজল:

চট্টগ্রামকে সর্বক্ষণ রহমতেরই সুসংবাদ,
চট্টগ্রামের কখনোই কোন প্রকার নাই বিষাদ।
খোদা তাঁয়ালা করেন সদা কৃপা বারি বরিষণ,
চট্টগ্রামের উপর আছে আল্লাহ্ তাঁয়ালার করম।
আউলিয়ায়ে কেরামের সর্বস্থানে বিচরণ,
চট্টগ্রামে নবীজিরও রয়েছে নকশে কদম।
সাধনার স্থানও এটাই অধিকাংশ আউলিয়ার,
চট্টগ্রামই সমগ্র অনারবের অহংকার।
মূর্খতার অন্ধকার এতা কে-ই বা দেখেছে কখন,
চট্টগ্রামে জ্ঞানের প্রদীপ দীপ্তি থাকে সারাক্ষণ।
এতা হেদায়তের প্রদীপ দীপ্তি থাকে সারাক্ষণ,
চট্টগ্রামে এল্ম-আমল পরস্পর আছে দু'জন।

নিজ ধর্মের তরে হলে সন্ধানেষু কোন জন,
চট্টগ্রামের মাঝেই আছে ধর্মে ছিরতার গুণ।
'হৃকুম মাখসুবাতুন'র রহস্য এটাই যে হয় সর্বদা,
চট্টগ্রামেই মূর্তিময়ী প্রেমাঙ্গদের শশীমুখ।
নির্বাক সে নিজেই নিজের সতীত্বের হয় দাবীদার,
চট্টগ্রামই সর্বত্র সতীত্বের বাণু বরদার।
সকলেরই সজাগ দৃষ্টি যেন অটুট থাকে ন্যায় বিচার,
চট্টগ্রামের কোন স্থানে দেখবে না কেউ অবিচার।
ঈর্ষার চিহ্ন রাখে সদা বক্ষে ঐ সে কাশীরের,
চট্টগ্রামের আবহাওয়া যদি দৃষ্টিগোচর হয় নিজের।
গুণ্ঠ ব্যক্ত রূপ-লাবণ্য কত যে বর্ণিব আর,
চট্টগ্রামের বাগ-বাগিছা যেন জাল্লাতের গোলজার।
সর্বত্রই স্বচ্ছ জলের ঝর্ণা অনাবিল,
চট্টগ্রামের বুকেই আছে স্বর্গ বাগের 'সালসাবিল'।
চট্টগ্রামের তরে ঈর্ষা স্বর্গবাগের হে মকবুল,
চট্টগ্রামের বুকেই যখন গাউসুল আয়মের বাসস্তুল।

বিশেষ করে, মাইজভাণ্ডার শরিফের পবিত্র মাটির বুয়ুর্গী বা
মর্যাদাশীলতা দৃশ্যমান। তার গুণ, বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্যের প্রশংসা
বর্ণনা অপরিমেয়। যদি কোন বেদনা যুক্ত ব্যথিত অন্তরে
চিকিৎসা থাকে তবে নিশ্চিত তা মাইজভাণ্ডার শরিফের
ধূলাবালিই যার অস্তর্চক্ষু আনওয়ারে মারেফাতে ইলাহী (খোদা
পরিচিতি উৎসের আলো) হতে অঙ্কের জন্য মাইজভাণ্ডার
শরিফের পবিত্র মাটি তুর পর্বতের প্রভাবময় সুরমা।
মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি কী? ব্যথিত হৃদয়ের বেদনার
চিকিৎসায় মহোষধী, মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি কী?
আনোয়ারে ইলাহী (খোদার নূরসমূহ)'র ভাণ্ডার মাইজভাণ্ডার
শরিফের মাটি কী? আসরারে খোদায়ী (আল্লাহর রহস্য)'র
উৎস। মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি কী? হিংসা বিদ্বেষের
নির্ব্বিকারক। মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি কী? ইরফান
(আল্লাহর পরিচয় লাভে) আরশের সোপান। মাইজভাণ্ডার
শরিফের মাটি কী? মক্কা মদিনার রহস্যের বাস্তবতা।
মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি কী? 'কুনতু কুনযাম মাখফীয়ান'
অর্থাৎ আমি ছিলাম গুণ্ঠ খনির গুণ্ঠ ধন। মাইজভাণ্ডার শরিফের
মাটি কী? হাকায়েকে জাব্রতিয়ার ভাণ্ডার। মাইজভাণ্ডার
শরিফের মাটি কী? 'জলোয়ায়ে লাহুতীয়া' মিলনায়তন।
মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি কী? 'তাজালিয়াতে মাহুতিয়া'র
প্রকাশ। মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি কী? 'হাকীকতে
হাহুতীয়ার নুর (দ্র. জবরুত, লাহুত, মাহুত, হাহুত- এগুলো

তাসাওউফ পরিভাষা। আত্মার উরজিয়তের একেকটি স্তর
-অনুবাদক)। মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি কী? সমস্ত পানি ও
মাটির কিমীয়া (দুর্লভ ও অত্যন্ত প্রিয় বস্তু)। মাইজভাণ্ডার
শরিফের মাটি কী? প্রত্যেক জান এবং দিলের চন্দ্রিমা।
মাইজভাণ্ডার শরিফ কী জিনিস? ন্যায়পরায়ণতা ও
সম্বিচেনার রচয়িতা। মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি করুণার
আধার। মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি কুদ্রতের রহস্য।
মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি খোদায়ী হেকমতের জ্যোতি
সমষ্টি। মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি 'আসরায়ে হাকীকতে
নববীয়া (হাকীকতে নববীর মূল রহস্য)। মাইজভাণ্ডার
শরিফের মাটি আহাদিয়তের স্তোত্রধারা। মাইজভাণ্ডার শরিফের
মাটি ওয়াহদাতের স্বরচিহ্ন। মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি
সকলের বাসনাস্তুল। মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটি প্রত্যেক
প্রেমমন্ত বুলবুলের ফুল।

মাইজভাণ্ডার শরিফের মাটির গুণাবলি বর্ণনায় জবান, কলম
কর্তিত। তার আগে চলা মরণ্ভূতিতে ধূঃস হওয়া যার বোধ
শক্তি আছে তাকে এই এক ইঙ্গিত-ই যথেষ্ট।

গজল

কী লিখিব গুণাবলি আমি
পাক মাটি মাইজভাণ্ডারের,
পাত্রে কেমনে পুরাবে কেহ
“কুলযুম” সাগরের আস্রারের।
খোদার রাজের আয়না যে হয়
মৃত্তিকা মাইজভাণ্ডারের,
কুদ্রতের জলোয়া যে হয়
প্রতি জরুরা এ দরবারের।
“তুরে সিনা”র মাটি যদি
সুরমা হয় গো প্রত্যেকের,
তার মাটি ও সুরমা যে হয়
দৃষ্টি ধারিব নয়নের।
এ গোলক ভূ-পঞ্চের স্বয়ং
মাকসুদ যে কি যাবে জানা
ভূ-পঞ্চের কল্যাণময় স্থান
এই মাটি মাইজভাণ্ডারে।
মাইজভাণ্ডারের মাটি মূল যে হয়
ন্যায় ও সাম্যের,
বরং প্রত্যেক জরুরা-ই তার

কিমিয়া হয় যে আস্রারের।
গোমরাহীর অন্ধত্বের চোখের
এটাই যে হয় সু-নিশ্চিত,
মাইজভাগুরের মাটি-ই নিশ্চয়
সুরমা যে সব হয় নূরের।
ঐ গুণাবলি লিখতে আজি
ভাঙা কলম মকবুলের,
গুণ্ঠাহীর গুণের উর্ধ্বে
মর্যাদা মাইজভাগুরের।

হযরত গাউসুল আযম রাদ্বিয়াল্লাহু রাবুল আলম'র সু-খ্যাতিময় শ্রেষ্ঠ ধর্ম জ্ঞানী, সংযমী পুণ্যবান সম্মানিত। পিতার শ্রুতিমধুর পবিত্র নাম জনাব শাহ সুফি সৈয়দ মতি উল্লাহ (ক.)। খোদার দরবারে গৃহীত, এ যুগের ‘ফাতিমা’ মমতাময়ী মাতার নাম মোবারক হযরত খাইরুন নিসা (রা.), যেন হযরত ফাতিমা যাহুরা (রা.)'র উপাধি “খাইরুন নিসার রহস্যময়ী চিহ্ন” “হযরত সুলতানে জিলান রাদ্বিয়াল্লাহুর রাহমান”।

গাউসুল আযম জিলান'র আম্মাজানের নাম মোবারক ও ফাতিমায়ে সানি ছিল এবং কিয়ামতের হিসাব দিনে প্রত্যেক মানুষকে আপন আপন মায়ের নামেই আহ্বান করা হবে।

এ কথা গোপন নয় যে: যখন গাউসিয়ত সমুদ্রে গুপ্ত অতুলিত মহামূল্যবান “মুক্তা” বস্তুকালীন বৃষ্টিরপে পিত্র ওরস থেকে বিনুক রূপ মাত্রগতে আবৃত্ত হলেন এবং পুণ্যময় শুভ অধিষ্ঠান লক্ষণ নিকটে এসে পৌঁছল (তখন) রহের জগৎ ও দুনিয়ার জগৎ সর্বস্থানে তাঁর হর্ষ প্রকাশের উৎসবে মুখরিত ও মালায়ে আলাক ফেরেশ্তাদের তার অধিষ্ঠান ঘোষণা হতে লাগল। (এমন কি) আসমানি জগতে “মালাকুতী” তাস্বীহ পাঠকারী ফেরেশ্তারা সুখ্যাতিময় তাসবীহুর হর্ষ – ফুলতার ঢেউ ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছাল। আর নাসুতি ভূ-লোকবাসীরা প্রেমাহাদের তবলা-তাম্বুরার ধ্বনিতে আসমানি ফেরেশ্তাদের কর্ণ কুহরকে পূর্ণ করে দিল। অভিলাষীদের বিভিন্ন কল্যাণময় নির্দেশনাদির চিহ্ন ও প্রমাণসমূহ প্রত্যেক জওয়ান-বৃন্দ-বনিতার ললাটে প্রতীয়মান হতে লাগলো “আহলে ইয়াকিন” বা নিশ্চিত বিশ্বাসী মুমিনগণের ললাট “নূরে ই'কান” বা নিশ্চয়তার জ্যোতিতে মধ্যাহ্ন তপন সদৃশ্য ঝল্কাচ্ছিল। “ঘীনে মতিন্দি'র মুখমণ্ডল লাল গোলাপের রং বিশিষ্ট ফুলের মত “সাদ্কাত্” বা “সত্যবাদিতা” ও “ঈমানী” প্রসাধনের জ্যোতি বিচ্ছুরণে উজ্জলিত। প্রলক্ষিত বিচ্ছেদে বিপর্যস্ত, আশেক-প্রেমিকদের

আলোর মিলন প্রফুল্লতার নেশাময় দিষ্টীলয়ে পরিণত হল। বিরহে কাঠিগুময় শোকের আলোয় বদান্যতার্পণ সুন্দরের দর্শন নেশার আনন্দ-ফুর্তির আলোয়ে রূপান্তর হল। ভূ-মণ্ডলের সর্বস্থলে আনন্দে মসজিদে-মন্দিরে শায়খ-ব্রাহ্মণ সকলেই তাঁর অভিনন্দন জ্ঞাপনের রাজীন শরাব ও আগমনী বার্তা ঘোষণার সুমিষ্ট মধুর অতিশয় প্রসঙ্গকারী রসনা প্রস্তুত। কালের বুলবুল সকলের মতেক্যে তাঁর সু-স্বাগতের গীত গজল ও তাঁর সুভাগমনের স্বর-মাধুর্য গীত-ধ্বনিতে প্রশান্তিময় বর্ণনা এই যে, “সোব্হানাল্লাহীল আজিম” (আল্লাহর পবিত্রতা-ই সুমহান)। কী পুণ্যময় যুগ ও কী বরকত মণিত দিন এসে গেল যে, এবার জগতের কুসুম কাননে প্রাণ বর্ষক বসন্তকাল এল, ভোরের বায়ু প্রেমাঙ্গদের মিলনের খবর নিয়ে এল। কুসুম হৃদয়ে কুঁড়ির বন্ধ কজা খুলে গেল। আশা-আকাঙ্ক্ষার পুষ্পরাজি কল্ক কল্ক করে হেসে উঠল। ইচ্ছার বাগানের ঝুতু পাল্টে গেল। আশার বৃক্ষ ফুলে ফলে ভরপূরে উল্লাসিত হল। লোহিত পুষ্পের বক্ষ অনাদিকাল হতেই তাঁর আকাঙ্ক্ষায় ছিল ভিল্ল ছিল। প্রত্যেক বিদীর্ঘতা এখন তাঁর শুভাগমনের অভিনন্দনে “নগরবাসী” তুল্য উল্টো আপাদমন্তক কর্ণময় এবং তাঁর অক্ষয়ী সৌন্দর্যের প্রতীক্ষায় সর্বাঙ্গ নেত্রময় হয়ে আনন্দে আত্মাহারা। সকলের এটাই চর্চা যে, “হযরত মাহবুবে খোদা” এখন দুনিয়ার জগতে পদার্পণ করেছেন। রং ও সুস্মান উল্লাসিত হয়ে বলেছে যে, “হযরত মাশুকে ইলাহী” এখন বাঁকজমকের সাথে দুনিয়ার সভায় আবির্ভূত হচ্ছেন। জীব-জড় উদ্বিদাদি আপন আপন ভাষায় একে অপরের সাথে এ কথোপকথন করছে যে, “হযরত কুতুবুল্লাহীল আক্রম রাদ্বিয়ান হুল্লাহুল আরহাম” আলমে শাহাদাতের সভা আকর্ষক হচ্ছেন আউলিয়া কিরামের পবিত্র সভাসমূহে তাঁর খোঁজ-খবর ও মুত্তাকীগণের (আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়ালু) পবিত্র মাহফিলে ও তাঁর আলোচনা এটাই যে, সত্ত্ব-ই হযরত মাহবুবিল হক্ক নূরে আলম হযরত ফারদুল্লাহিল আফখম গাউসুল্লাহিল মাইজভাগুর রাদ্বিয়ান হুল্লাহুল বারী” র্ণাঙ্গনময় ভূবনে ওজ্জ্বল্যময় ফুল হয়ে পদার্পণ করেছেন ও ভবকাননকে আপন সমৃদ্ধিময় শুভ পদচারনার সেচকার্যে তরুতাজা ও সবুজ শ্যামল করেছেন। জগৎবাসীর আকাঙ্ক্ষার আঁচলকে তাঁর “ফয়জ” ইরশাদ পথ প্রদর্শনের সাহায্যে রং বে-রঙের মাকসুদের ভরপুর করে দিয়েছেন। (চলবে)

মহিলা মাহফিল

হ্যরত শীস (আ.)—এর বেহেষ্টী স্ত্রী হুর প্রসঙ্গ ফারাহানা আকতার চৌধুরী

প্রথম নবী এবং মানব হ্যরত আদম (আ.)'র অন্যতম পুত্র সন্তান হলেন হ্যরত শীস (আ.)। হ্যরত আদম (আ.) এর পুত্র হাবিল নিজ ভাতা কাবিলের হাতে নির্জন পাহাড়ে শহীদ হলে হ্যরত আদম এবং হাওয়া (আ.) খুবই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। পুত্র হারানোর বেদনায় বিমর্শ হ্যরত আদম-হাওয়ার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে আল্লাহ পৃথিবীর প্রথম দম্পতিকে বিশেষ উপটোকন হিসেবে এক সু সন্তান দান করেন। এই সুসন্তানের নাম হ্যরত শীস (আ.)। হ্যরত আদম-হাওয়ার অন্যান্য সন্তানসমূহ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন জোড়ায় জোড়ায়। কিন্তু হ্যরত শীস (আ.) একাই মাত্রগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। অর্থাৎ তার কোন জোড়া ছিল না।

মহান আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে হ্যরত আদম (আ.)'র জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের পয়গাম আসে। এক হাজার বছর বয়ক্রমকালে হ্যরত আদম (আ.) ক্রমশ রোগাক্রান্ত হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি পথ্য হিসেবে খাওয়ার জন্য তার পুত্রদেরকে বিভিন্ন ফল ফলারির ফরমায়েশ করেন। পিতার নির্দেশ মতো হ্যরত শীস (আ.) ব্যতীত সকলে ফল ফলারি সংগ্রহের জন্য নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু ফল ফলারি সংগ্রহে তাদের বিলম্ব ঘটে। তাঁরা আদৌ কোন ফল সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিনা এ নিয়ে তিনি চিন্তিত থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হ্যরত শীস (আ.) সমীপে তিনি পাহাড়ের শিরোপারি ওঠে বেহেশ্তি ফল ফলারি প্রেরণের জন্য আল্লাহর নিকট আর্জি পেশের নির্দেশনা দেন। পিতার নির্দেশ শ্রবণ করে হ্যরত শীস (আ.) হতবাক হয়ে বলেন “আপনি আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর আপনি আর্জি পেশ করলে মহান প্রতিপালক তা অবশ্যই করুল করবেন। আল্লাহ তাঁয়ালা আপন মহিমায় আপনার জন্য পচন্দকৃত প্রয়োজনীয় ফল ফলারি প্রেরণ করবেন। পুত্রের কথা শুনে হ্যরত আদম বলেন, “আমি নিজের ব্যাপারে আল্লাহর সমীপে শরমিন্দা (লজ্জিত)। পৃথিবীতে প্রেরণের উসিলা হিসেবে বেহেশ্তে সংঘটিত ঘটনার জন্যে আমি ফল ফলারি বিষয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাতে লজ্জা বোধ করছি। তুমি এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নও। তুমি পুত্র পৰিত্র। মহান আল্লাহ তোমার আবেদন মঞ্জুর করবে বলে আশা রাখি। অবশ্যে হ্যরত আদম (আ.)'র নির্দেশ মতো নির্দেশিত পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান নিয়ে রোগাক্রান্ত পিতার অভিলাষ জানিয়ে হ্যরত শীস (আ.) আল্লাহর দরবারে প্রয়োজনীয় ফল ফলারির জন্য প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা শেষে হ্যরত শীস (আ.) লক্ষ্য করলেন, হ্যরত জিবরাইল (আ.) সোনালী রংয়ের রেকাবীতে করে ডুমুর, ডালিম, সেব, নারাঙ্গী, কমলালেবু, আঙুর, আঞ্চির, খরবুজা প্রভৃতি ফল নিয়ে আসলেন। ফলভর্তি রেকাবীটি একজন হুর মাথায় বহন করছে, রেকাবী বহনকারী হুরকে দেখে হ্যরত আদম (আ.) হ্যরত জিবরাইল (আ.)'র নিকট হুরের পরিচয় জানতে চান। হ্যরত জিবরাইল নবী হ্যরত

আদম (আ.) কে জ্ঞাত করেন যে, “মহান আল্লাহ এই হুরকে হ্যরত শীস (আ.)'র স্ত্রী হিসেবে মনোনীত করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। কাসাসুল আম্বিয়া'য় হ্যরত আদম (আ.)'র জন্য ফলের রেকাবী বহনকারী হুরকে হ্যরত শীস (আ.)'র বিবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। প্রায়ই সকলেই বেহেশ্তী হুরের সঙ্গে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হ্যরত আদম (আ.) হ্যরত শীস (আ.)'র বিয়ে পড়িয়ে দেন বলে উল্লেখ করেছেন। ভিন্ন মত পোষণকারীদের মতে হ্যরত আদম (আ.)'র জন্য ফলের রেকাব বহনকারী হুর পুনরায় বেহেশতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে এই হুরের সঙ্গে হ্যরত শীস (আ.)'র বিয়ে হবে বলে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে আলেমুল গায়েব মহান আল্লাহ রাকুল আলামিন সর্বাধিক জ্ঞাত।

হ্যরত শীস (আ.)'র স্ত্রী হিসেবে প্রেরিত বেহেশ্তী হুর—এর ভাষা ছিল আরবী। তাঁর গর্ভজাত সকল সন্তান আরবী ভাষী ছিলেন। আখেরি পয়গম্বর, বিশ্বনবী হ্যরত মুহাম্মদ (দ.) বেহেশ্তী হুরের গর্ভজাত সন্তানদের অধস্তুন বৎসর বলে উল্লেখ করা হয়। ইতোমধ্যে হ্যরত আদম (আ.)'র অন্য সন্তানগণ কোন প্রকার ফল ফলারি সংগ্রহ করে আনতে না পেরে হতাশ অবস্থায় পিতৃ সমীপে উপস্থিত হন। হ্যরত আদম (আ.) পুত্রদেরকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করে বেহেশত থেকে প্রেরিত ফলের অবশিষ্টগুলো সন্তানদেরকে খেতে দেন। এ সময় তিনি মহান স্ত্রী আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায় গ্রহণের নির্ধারিত সময় অবহিত করে আল্লাহর নির্দেশে হ্যরত শীস (আ.)—কে নবী হিসেবে স্থূলভিষিক্ত বলে ঘোষণা করেন। হ্যরত আদম (আ.) আল্লাহর দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব হ্যরত শীস (আ.)'র উপর অর্পন করে অন্য পুত্রদের হ্যরত শীস (আ.) কে পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশনা দেন। সকল পুত্র হ্যরত আদম (আ.)'র নির্দেশনা অনুযায়ী দ্বীন প্রচারের বিষয়ে হ্যরত শীস (আ.)'র আনুগত্য মেনে নেন। হ্যরত আদম (আ.)'র সমস্ত সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমবর্তন করে দেয়া হয়। যেহেতু হ্যরত শীস (আ.) হোদায়েতের কাজে ব্যক্ত সময় অতিবাহিত করবেন সেহেতু তাঁর সম্পত্তির আয় উপার্জনের বিষয় অন্য সকল ভাই দেখতাল করবেন এবং ব্যয় নির্বাহের খরচ ব্যতিরেকে একটি যৌক্তিক অংশ জীবিকা নির্বাহের জন্য হ্যরত শীস (আ.)'র জন্য প্রেরণ করবেন, এক কথায় হ্যরত শীস (আ.) কে কায়িক শ্রম থেকে মুক্ত রেখে মানসিক শর্মে নিযুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। বৈষয়িক দায়িত্ব পালন থেকে অবমুক্তি প্রাপ্ত নবী হ্যরত শীস (আ.)'র স্ত্রী ছিলেন নিজেই হোদায়েত অভিলাষীদের পথিকৃত। মহান আল্লাহ দ্বীয় অসীম কুদরতের নিশানা হিসেবে পৰিত্র নবুয়ত ধারা হ্যরত শীস (আ.)'র বেহেশ্তী হুর স্ত্রীর মাধ্যমে বিকশিত করেছেন। সুন্মা আমিন।

শিশুতোষ

ছোট কাঞ্চনপুরের বড় উপলব্ধি

মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

ছোট বঙ্গুরা, তোমরা ছোট কাঞ্চনপুরের নাম শুনেছ? না শুনলেও কোনো সমস্যা নেই। ছোট কাঞ্চনপুরে পাহাড় আছে। বন আছে। গাছগাছালি আছে। গাছগাছালি থাকলে পাখ পাখালিও আছে। পাহাড়, বন, গাছগাছালি থাকা মানে সবুজ থাকা, পাখ পাখালি থাকা মানে গান থাকা, গান থাকা মানে সুর থাকা। সবুজ মানে ধূসর উধাও হওয়া, সুর থাকা মানে অসুরের বিদায় নেয়া। এখানকার মানুষ পছন্দ করে সুরের বংকার, তারা পছন্দ করে না অসুরের তাঙ্গু।

এ গ্রামের নামের শুরুতে ‘ছোট’ পদবী থাকলেও এখানকার মানুষ কিন্তু ছোট নয়। তারা বড়। বড় অবশ্য ধনে নয়, মনে। এ নিয়ে তারা রীতিমতে গর্ববোধ করে কিন্তু অহংকার করে না। তারা বলে; আমাদের ঘরগুলো ছোট কিন্তু মনগুলো বড়। সব মানুষকে আমরা ঘরে জায়গা দিতে পারি না। কিন্তু

আমাদের মনে জায়গা আছে সব মানুষের। এমনকি সে সব মানুষের বিচরণ যদি হয় দুনিয়া জুড়ে।

এ গ্রামের মানুষ মারামারি করে না। কোথাও মারামারির কথা শুনলে তারা আশ্র্য বোধ করে। তারা বলে আমরাতো সবাই একদিন না একদিন মারা যাবই। তাহলে মরে যাওয়ার আগে আমরা কেনই বা বেছদা মারামারিতে জড়াব? আমরা কোনো মৃত মানুষকে হিংসা করিনা, কারণ সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। পাশাপাশি কোনো জীবিত মানুষকেও আমরা হিংসা করিনা। কারণ আমরা জানি সেও একদিন মারা যাবে।

এ গ্রামে বাস করতেন দু'ভাই। হ্যরত আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী ও হ্যরত আবদুল হাদি কাঞ্চনপুরী। দু'জনের দর্শন ও গান ছোট কাঞ্চনপুরের মানুষকে বড় মনের মানুষে পরিণত করেছে।

আল কোরআনের আলো

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পৃথিবীতে মানবজাতির বাসস্থান নির্ধারণের পর পার্থিব জগতে মানুষের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পারস্পরিক সম্পর্ক এমনকি আল্লাহ্ সৃষ্টি অন্যান্য জীব, প্রাণী, বৃক্ষরাজি, নদী, সাগর, পাহাড়-পর্বত বিষয়েও আচরণের নীতিমালা ঘোষণা করেন। আল্লাহ্ সৃষ্টি বিষয়ে আল্লাহ্ নির্ধারিত বিধি-বিধান লজ্জন না করার জন্যে পবিত্র কোরআনে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যে কোন জনপদে আল্লাহ্ বিধানের চূড়ান্ত লজ্জন করাকে সীমালজ্জন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বর্ণিত জনপদের দ্রষ্টান্ত উল্লেখ করে সুস্পষ্ট ভাষায় চরম শাস্তির বিষয়ে বারবার পূর্বাভাষ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে. “তোমরা কি নিশ্চিত আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরসহ ভূমি ধসিয়ে (ভূমিকম্প) দেবেন না। আর তা থর করে কাঁপতে থাকবে না। তোমরা কি নিশ্চিত, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের কক্ষের বৃষ্টি করবেন না। তখন জানতে পারবে কত কঠোর ছিল আমার (আল্লাহ্) সতর্কবাণী”- (সূরা মুলক: ১৬-১৭)।

১১৭তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে ‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’-এর ১২ দিনব্যাপী কর্মসূচি

(১) পঞ্চদশ শিশু-কিশোর সমাবেশ আয়োজনের প্রস্তুতি উপলক্ষে প্রতিযোগিতার আসরের একটি ইভেন্ট, (২) পঞ্চদশ শিশু-কিশোর সমাবেশে প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার এইচ. ই. ডাক্তার রাজীব রঞ্জন, (৩) নবম শিক্ষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মহাহিসাব রক্ষক ও নিরীক্ষক মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, (৪) ‘দি মেসেজ’ আয়োজিত ‘ইসলাম ও নারী সুফি’ শীর্ষক মাহফিল, (৫) ‘আলোর পথে’ আয়োজিত ‘নারীর কর্মদ্যোগ এবং ইসলাম’, (৬) মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত ‘একবিংশ শতাব্দিতে আলিমদের নেতৃত্বের রূপরেখা’ শীর্ষক ৯ম উলামা সমাবেশ, (৭) মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতে আন্তর্ধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব শীর্ষক ১০ম আন্তর্ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলন, (৮) ‘এস জেড এইচ এম বৃত্তি তহবিল’ আয়োজিত ২০২২ পর্বের তিন ধাপে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান, (৯) ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে ‘র্যালী ও আলোচনা সভা’ আয়োজন, (১০) মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণাধীন দেশ-বিদেশের শাখা কমিটিসমূহের উদ্যোগে এলাকার মসজিদে মিলাদ মাহফিল আয়োজন, (১১) উরসের দিন ট্রাস্ট-এর ব্যবস্থাপনায় ‘ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বলিত দূর্ভ চিত্র প্রদর্শনী’, (১২) উরসের পরদিন তোরে হ্যরত কেবলার পুকুর পাড় ও শাহী ময়দান হতে প্রধান সড়ক পর্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি।



(১) ২২ জানুয়ারি ২০২৩ রবিবার মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ জিয়ারতে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত এইচ. ই. মোস্তফা ওসমান তুরান। তাঁর সাথে ছিলেন তুরস্কের অনারারী কনসাল জেনারেল জনাব সালাহউদ্দিন কাসেম খান।
 (২) ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ রবিবার চট্টগ্রাম ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারের কার্যালয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফ ‘দরবার-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী’-তে গাউসিয়া হক মন্ডিল-এর সম্মানিত সাজাদানশীন ও ‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’-এর ম্যানেজিং ট্রাস্ট হ্যরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার এইচ ই. ডা. রাজীব রঞ্জন মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
 (৩) ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বৃহস্পতিবার আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার চেম্বার মিলনায়তনে ‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’-এর উদ্যোগে বিভিন্ন খাতে সহায়তা প্রাপ্তদের মাঝে চেক প্রদান করছেন চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইভাস্ট্রি’র সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম।
 (৪) ২৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার চতুরে জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র’ আয়োজিত দিনব্যাপী ‘চট্টগ্রাম রিসার্চ ফেস্টিভ্যাল’-এ ‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’ প্রকাশন ‘আলোকধারা বুকস্’ স্টলে দর্শনার্থীর ভিড়।
 (৫) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি চট্টগ্রাম জেলা ও সিটি ইউনিটের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম যুব রেড ক্রিসেন্ট-এর আয়োজনে ৪ দিনব্যাপী ৭ম বিভাগীয় যুব রেড ক্রিসেন্ট ক্যাম্প-২০২৩-এর সেশন কার্যক্রমে স্পন্সর প্রতিষ্ঠান ‘শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী’ (কঃ) ট্রাস্ট’-এর পক্ষে বিশেষ অতিথির উদ্দীপনামূলক বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী।





শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

০১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০২. উম্মুল আশেকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও হিফ্যখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
০৩. উম্মুল আশেকীন সৈয়দা সাজেদা খাতুন হিফ্যখানা ও এতিমখানা, নোয়াজিষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
০৪. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
০৫. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্সিটিউট (দাখিল), পশ্চিম গোমদঙ্গী ১৯নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
০৬. গাউসিয়া কলন্দরীয়া নষ্টমীয়া মাদ্রাসা হেফজখানা ও এতিমখানা, বেতছড়ি ১নং ওয়ার্ড, ১৩নং ইসলামপুর, ঠাণ্ডাছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
০৭. হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী আতর আলী মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, বোয়াবিলি, রাজানগর, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।
০৮. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) কুল, শান্তিরঞ্জীপ, গুহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
০৯. নোয়াজিষপুর মূসনীয়া আজিজিয়া মাদ্রাসা, নোয়াজিষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
১০. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী হিফ্যখানা ও এতিমখানা, হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
১১. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ইসলামি একাডেমি, হাইদরগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১২. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ইবতেদায়ী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৩. বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) কমপ্লেক্স, হাটপুরুরিয়া, বটলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
১৪. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব লালানগর, ছোট দারোঁগার হাট, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
১৫. মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী, পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৬. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৭. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ইসলামি একাডেমি, সেনবাগ, নোয়াখালী।
১৮. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৯. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী, বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
২০. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২১. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২২. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সির), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৩. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মনোহরদী, নরসিংড়ী।
২৪. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৫. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, এয়াকুবদঙ্গী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২৬. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।

২৭. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়ার হাট, ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

২৮. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

২৯. শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই (রেললাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) বৃত্তি তহবিল “সুবিধাবাস্তিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প”:

১. হ্যরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী দাতব্য চিকিৎসালয়, দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ

২. হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয় ও খত্না সেন্টার, মাইজভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

৩. সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহ (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম

৪. জামাল আহমদ সিকদার দাতব্য চিকিৎসালয়, স্টেলমিল বাজার, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম

৫. হ্যরত আকবর শাহ (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, ইস্পাহানী ‘সি’ গেইট, আকবর শাহ, চট্টগ্রাম

৬. হ্যরত সৈয়দ ছালেকুর রহমান শাহ (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, ধামাইরহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

৭. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী (ক.) দাতব্য চিকিৎসালয়, আজিমপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

৮. সৈয়দ আবদুল গণি কাথ্বনপুরী (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি, পার্বত্যজেলা

৯. মাইজভাণ্ডারী দাতব্য চিকিৎসালয়, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি, পার্বত্যজেলা

১০. সৈয়দুর রহমান আনোয়ারা বেগম দাতব্য চিকিৎসালয়, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

১১. হ্যরত সৈয়দ জালাল উদ্দিন বোখারী (রহ.) দাতব্য চিকিৎসালয়, দোহাজারী পৌরসভা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম

১২. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) দাতব্য চিকিৎসালয়, আগানগর, তৈরব, কিশোরগঞ্জ

১৩. সৈয়দ রহিমুল্লাহ শাহ (র.) দাতব্য চিকিৎসালয়, নতুনহাট, নোয়াজিষপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।

দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

যাকাত তহবিল দুষ্ট সাহায্য তহবিল

মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আলোকধারা বুকস মাসিক আলোকধারা

আত্মান্বয়নমূলক যুব সংগঠন: তাজকিয়া

মহিলাদের আত্মজ্ঞাসা ও জ্ঞানানুশীলনমূলক সংগঠন:

আলোর পথে দি মেসেজ

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন

বাইত-উল-আসফিয়া, মাইজভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ, বাড়ি # ৪, ব্লক # ক, মিরপুর হাউজিং এস্টেট, উত্তর বিশিল, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

জনসেবা প্রকল্প:

দৃষ্টিনন্দন যাত্ৰীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।

দৃষ্টিনন্দন যাত্ৰীছাউনী ও ইবাদতখানা, নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথা।

দৃষ্টিনন্দন যাত্ৰীছাউনী, শান-ই-আহ্মদিয়া গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে

ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ),

ভার্ম্যমাণ ওয়ুখানা ও টয়লেট।